সপ্তম অধ্যায়
নলিনী বেরার উপন্যাসে আদিবাসী জীবন

পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা সীমান্তের জঙ্গলমহলে অবস্থিত বাছুড়খোঁয়াড় নামক একটি ছোট্ট গ্রামে অত্যন্ত সাধারণ কৃষক পরিবারে নলিনী বেরা জন্মগ্রহণ করেন। সুবর্ণরেখা নদীর পার্শ্ববর্তী এই গ্রামে তাঁর জন্ম হয় ১৯৫২ সালের ২০ শে জুলাই। অরণ্যঘেরা জন্মভূমিকে তিনি বরাবরই স্থান দিয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। শুধু জন্মভূমিকেই নয়, তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন সুবর্ণরেখা বিধৌত জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে লালিত বিভিন্ন জনজাতির জীবনকে। 'শবরচরিত' উপন্যাসে বিশেষত স্থান পেয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের জনপদ। এই জনপদের বিভিন্ন জনজাতির কথা উঠে এসেছে আলোচ্য উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক শবর-লোধা-ভূমিজ-সাঁওতাল-মাহাতোদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি তৈরি করেছেন। যা তৈরি হয়েছে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায়। ফলে তা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত নিখুঁত। এই উপন্যাস রচনা সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন—

> *"ভাবতে ভালো লাগে প্রত্নবৃত্তান্ত অনুসন্ধানের মতোই ঘনিষ্ঠ নিষ্ঠায় একটি দীর্ঘ উপন্যাস লিখেছেন নলিনী বেরা যা সর্বাংশেই পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার অন্তর্বর্তীএক মানব গোষ্টি লোধা-শবরদের জীবনবৃত্তের সামগ্রিক মানচিত্র সৃষ্টির শুদ্ধ প্রয়াস।"*[১]

নলিনী বেরার প্রিয় নেশা আদিবাসী অধ্যুষিত জন্মভূমিতে ঘুরে বেড়ানো। তিনি 'শবরচরিত' উপন্যাসটি লেখাকালীন দীর্ঘ দশ বছর শবর-লোধাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে তার উল্লেখ রয়েছে—

> *"বিগত প্রায় দশটা বছর আমি আছি রাইবু-গুরভা-গুড়গুড়িয়া-গুড়কুঁদা-শারাবন-শতুরা-ফুলটুসি-শিশুবালা-সোমবারি-নিয়তি-সাবিত্রী-ঢালো-আদরী-ভাদরী-নুকু-ভুটকী-গুরুবারি-চাঁদবদনী-হাড়িয়া-সুরুয়া-নাকফুড়ুরি-লাইবুকা-নীলুয়াদের*

সঙ্গে। ছিলাম ডুব্‌কা-ডুংরিতে বনে-ঝাড়ে-বনকুঁদরী-বনকল্লা-বনকাঁকড়ো আলু-তুঙা ভেলা-ভুড়রু-কেঁদ-কষাফল আহরণে, গোই-গোধি-ঢ্যাম্‌না-খঙ্গা বঙা শিকারে। ছিলাম নামাল খাটায়, দাঁতনে, কড়িয়া বামনদায়। লেখা শেষ করে এই মুহূর্তেই মনে হল, আমি বুঝি স্বজনহারাই হলাম। বিষাদ ছুঁয়ে যাচ্ছে মনে।"[২]

তিনি শবরদের সঙ্গে বছরের পর বছর শুধুমাত্র সশরীরে কাটাননি। শবরদের সঙ্গে আত্মিক যোগের ব্যাপারটি এখানে বড় হয়ে উঠেছে। ফলে আলোচ্য উপন্যাসে তিনি তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র বিধৃত করতে পেরেছেন। এই জনগোষ্ঠীকে ব্রিটিশ রাজশক্তি এক সময় 'অপরাধপ্রবণ' আদিবাসী জনগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করেছিল। যে অপবাদ থেকে বের হওয়া হয়তো তাদের পক্ষে আজও সম্ভব হয় নি। যার ফলে এদের সামাজিক অবস্থা আজও প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত। উপন্যাসে শবরদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি যথেষ্ট বাস্তবতার অভিজ্ঞানে গড়ে তোলা হয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

উপন্যাসে যে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের নিরিখে শবরদের সামাজিক রূপের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে সেটি মূলত ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা পূর্ব-মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার, নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার মতো বেশ কিছু স্থান নিয়ে গঠিত জঙ্গলমহল। এই ভূমিক্ষেত্রের সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত জনগোষ্ঠী হচ্ছে শবর । ঔপন্যাসিক এদের কখনো 'লোধা-শবর' বলে চিহ্নিত করেছেন, কখনো শুধু লোধা অথবা শুধু 'শবর' বলে চিহ্নিত করেছে। উপন্যাসের প্রচ্ছদে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

"এ উপন্যাস তাদেরই নিয়ে লেখা যারা ঐতরেয়ব্রাহ্মণে 'শবর' ঋগ্‌বেদে 'অসুর' অমরকোষে 'ম্লেচ্ছ' মৎস্য আর বায়ু-পুরাণে 'ক্ষত্রিয়'। তাছাড়াও 'লোধা', খেড়িয়া', আক্‌খুটি' ইত্যাদি কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মতই নানা নামে চিহ্নিত ও পরিচিত।"[৩]

সমাজস্তরের দিক থেকে এদের অবস্থান নিম্নস্তরে। ইংরেজ শাসনকালে নিয়তি এদের জীবনকে যে অন্ধকারময় পথে ঠেলে দিয়েছিল সেই অন্ধকার পথ তাদের

কাছে যেন অনন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিয়তির প্রকোপেই এরা যেন ইংরেজ-শাসনোত্তর যুগেও আলোর দিশারী খুঁজে পাচ্ছে না। অরণ্য মায়ের সঙ্গে নাড়ীর যোগ থাকা সত্ত্বেও অবাধে অরণ্যে বিচরণ করা এদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ফরেস্টগার্ড এদের দেখলেই তাড়া করে, বনসম্পদ চুরির দায়ে থানায় চালান দেয়।

আদিবাসী সমাজ মাত্রই অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত। লোধা-শবরেরা এর ব্যতিক্রম নয়। বনসম্পদ সংগ্রহ এবং কৃষিকার্যে মজুর হিসেবে শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত যে জনগোষ্ঠী সেই জনগোষ্ঠীকে ইংরেজ সরকারের শাসনকালে 'অপরাধপ্রবণ জাতি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 'অপরাধপ্রবণ জাতি'র এই অপবাদ লোধা-শবরদের জীবনকে বিধ্বস্ত করে তোলে। যা ব্রিটিশ শাসনের পরও এদের জীবনযাত্রাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

লোধা-শবরদের বৃত্তির দিকে তাকালেই এদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আঁচ করা যায়। নারীরা বন জঙ্গল থেকে ফুল-ফল-মূল-শাক-পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে। এই সব বনজ সম্পদকে এরা এদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ব্যবহার করে। এবং যা থেকে যায় তা বিক্রি করত আশপাশের গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে। পুরুষেরা বন থেকে বনজ সম্পদ, যেমন-কাঠ, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ এবং বিক্রি ছাড়া বিভিন্ন ধরনের পশুর চামড়া বিক্রি করে। কিন্তু বন-সংরক্ষণ আইন চালু হওয়ার পর থেকে লোধা-শবরদের প্রত্যহ বনে প্রবেশ বেআইনি হয়ে যায়, সপ্তাহে একদিন তারা বনে প্রবেশের অনুমতি পায়। ফলস্বরূপ এদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো ভেঙে পড়ে। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটাতে এরা বিকল্প জীবিকা অর্থাৎ দিনমজুরের কাজে নিযুক্ত হয়, কিন্তু সেখানেও তাদের শোষণ ও বঞ্চনার মুখ দেখতে হয়। 'অপরাধপ্রবণ' জাতির কলঙ্কটি মাথায় থাকায় তারা আশেপাশের গ্রামে কাজ পায়না। ফলে ঠিকাদারদের জালে বন্দি হয়ে দিনমজুরের কাজে তারা দূরদেশে পাড়ি দেয়। সেখানে দিন-রাত পরিশ্রম করেও তারা যথার্থ পারিশ্রমিক

পায়না। তবুও তাদের কোন অভিযোগ থাকে না। কারণ, টাকা-পয়সা কম পেলেও চুরির অপবাদ সেখানে নেই।

অবশ্য পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, সরকারের তরফ থেকে আদিবাসীদের জন্য নানা ধরনের প্রকল্প আরম্ভ করা হয়। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল পশুপালন, বাঁশ-চাষ, বাবুইঘাস চাষাবাদের জন্য সরকারের তরফ থেকে টাকা প্রদান। কিন্তু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের তাড়নায় পীড়িত লোধা-শবরেরা সরকারের প্রকল্পের সৎ ব্যবহারে ব্যর্থ হয়। উপন্যাসে দেখা যায়, সরকারের তরফ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত লোধা-শবরদের হাতে টাকা তুলে দিলে তারা সে টাকা দিয়ে পশু, বাঁশ ও বাবুই ঘাসের দানা না কিনে তা পেট-পূজায় খরচ করে ফেলে। আবার সরকারের তরফ থেকে প্রদত্ত ঘরগুলিও টিকিয়ে রাখতে পারেনা পেটের দায়ে। যাই হোক, লোধাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সন্ধানে এদের বৃত্তির সঙ্গে পরিচয় হওয়া গেছে।এছাড়া, এদের খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থান এবং পোশাক-পরিচ্ছদের আলোচনাতেও তাদের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার নজির খুঁজে পাওয়া যায়।

খাদ্যাভ্যাস

ঔপন্যাসিক এখানে অরণ্যনির্ভর লোধা-শবরদের রসনা তৃপ্তিকর খাদ্যের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন এই উপন্যাসে। সাধারণত আদিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস অন-আদিবাসীদের থেকে পৃথক। তবে উপন্যাসে লক্ষ করা গেছে, শবরদের খাদ্যাভ্যাস অন্যান্য আদিবাসীদের থেকেও আলাদা। এই পার্থক্য বিশেষত অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যই। ভাত খাবার ইচ্ছে থাকলেও সচরাচর এদের ভাগ্যে তা জোটে না। খুব কষ্টেই এরা ভাতের জন্য চাল জোগাড় করতে সক্ষম হয়। জমি না থাকায় এদের এই দুর্গতি দেখা যায়। শবরদের প্রধান খাদ্য বন থেকে সংগৃহীত ফুল, ফল, কন্দ, শাক-সবজী, মেটে আলু, তেঁতুল বীচি, মাহুল, বন থেকে প্রাপ্ত ছোট ছোট জীবজন্তু ইত্যাদি। কখনো কখনো এরা আবাদি জমিতে পড়ে থাকা ফসল সংগ্রহ করেও খাদ্য তালিকায় সংযোজন করে। এই প্রসঙ্গে 'শবরচরিত' উপন্যাসে আদিত্য সেনগুপ্ত এবং উপেনের কথোপকথন তুলে ধরা যেতে পারে—

"এরা কী খায়?"

সাপ, উন্দুর ব্যাঙ। বনের ফলমূল, কেঁদ-বহড়া-ভেলা-ভুড়রু। খাম আলু-পানআলু-আঁউলা-বাঁউলা-চুরকা। বাঁশকোরল-শালপঙড়া-কাড়হান-কুড়কুড়িয়া—

ভাত খায় না ?

না।

উপেন কম্পাউন্ডারের লোকটি শুধরে দিয়ে বলল, খায়। তবে পেলে তো !"[৪]

উপন্যাসে আমরা দেখি, গুড়খা, গুড়খার বউ ঢালো এবং তাদের ছোট ছেলে এক সঙ্গে বসে ইদুর-পোড়া খায়। দরিদ্র ক্লিষ্ট জীবনে ইঁদুর খেতে পাওয়া যেন তাদের কাছে পরম পাওনা। তাই গুড়খার ছেলে তার বাবা-মায়ের কাছে আবদার করে— *"বড় উন্দুর তার চাই না, ছোট ছোট লাল লাল, এখনও চোখ ফুটেনি—এমন উন্দুরই তার চাই, অন্তত তিনটা।"*[৫] তবে সব শবরের ঘরে একই রকমের খাদ্যাভ্যাস নয়। যাদের অবস্থা একটু ভালো তারা শৌখিনভাবে ভাত-ডাল-সবজী ইত্যাদি রান্না করে খায়।

শবরদের দৈনন্দিন খাদ্য সমূহ অন-আদিবাসী শহুরে জীবনযাপনকারী মানুষদের চোখে অন্যরকম ঠেকলেও এই খাবারগুলি শবরদের কাছে অমৃত সমান। স্কুল পড়ুয়া লক্ষীরানী মল্লিক ওরফে নুকু স্কুল হোস্টেলে থাকাকালীন ডাল, ঢ্যাঁড়শের ঘন্ট, বৈতালের ঘেঁট, লাউয়ের চুপি, চপের ডালনা, মাঝেমাঝে রুই মাছ, তুড়-গেঁতি-ধানাহূলুমাছ ইত্যাদি খেতে পেলেও, তার মন পরে থাকে গোধি, চিড়্রা, ঢ্যামনা সাপের মাংস, কাল্লাকাঁকড়ো ভাজা, চেঁকাশাক-বনপুঁইপাতার ঝোল, সীতানালা খাল ধারের শুশনি শাক-পোড়া, কেঁদ-ভুড়রু-ভেলা কচড়া-কুসুম ইত্যাদি।

উল্লেখিত খাদ্যসমূহ লোধা শবরেরা জঙ্গলে থাকাকালীন সময়ে খেলেও পরবর্তীতে জীবিকার সন্ধানে কামিন খাটতে গেলে এদের খাদ্য তালিকায় এসে যুক্ত হয় সেখানকার অধিবাসীদের খাদ্যসমূহ। যে বাড়িতে তারা কামিন হিসাবে নিযুক্ত হয় সেখানে তাদের রোজকার খাবার তালিকায় ছিল— *"সকালে এক কুঁচি ফপ্রা মুড়ি, দুপুরে 'পাখাল', আর এই তো সাঁঝবেলায় চাট্টি ভাত।"*[৬] আবার নামাল খাটতে গিয়ে নীলেশ্বর যখন শবরদের খোঁজে মা-মনসা গ্রামে পৌঁছোয় এবং সে গ্রামের মাতব্বর

পঁচাশি বছরের ভিকা ভক্তার নাতি মকরার সঙ্গে সখা সম্বন্ধ পাতে তখন সেই সখা পাতানোর অনুষ্ঠানে সে খেতে পায় সুস্বাদু খাদ্য। অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় ভাত, মুরগা, মুসুরের ডাল, বাড়ির কাঁচকলা। নীলুয়ার কাছে এ-খাওয়া 'মকর' বা 'বাঁধনা' পরবের চেয়ে কম নয়। চোখ না-ফোটা লাল লাল ইঁদুরের ছানা কাঁচায় কচমচিয়ে খাওয়াই যাদের খাওয়া, তাদের কাছে এ-খাওয়া অমৃত থেকেও বেশি। দূর দেশে কামিন খাটতে গিয়ে লোধা শবরদের আর আউলা-বাউলা, কুরকুট-মুরকুট, আলতিশাক, বিছাতিশাক, গোধিসাপ, ঢ্যামনাসাপ, খঙ্গা, বঙ্গা খেতে হয় না। খায় চাষের চালের শুকনো ভাত এবং নদীর জল থেকে সংগৃহীত নানা ধরনের মাছ তারা।

বাসস্থান

পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা সীমান্তবর্তী এলাকার জঙ্গলমহলে বসবাসকারী লোধা শবরদের বাসস্থান সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যায়। উপন্যাসের প্রথম পর্বে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোধা-শবরদের ঘর-বাড়ি ইট পাথরে নির্মিত নয়। পাতার ছাউনি দেওয়া পাতার 'কুঁড়িয়া'। কোনটায় বা খড়ের চাল। ছিটে বেড়ার দেওয়াল। বাঁশের তৈরি দরজা। যাতে ছিটকিনির ব্যবস্থা নেই। দরজা বন্ধ করতে হলে এরা শিল পাথর বা এরকমই কিছু ভারি জিনিস দিয়ে দরজা আটকায়। প্রথম পর্বের শেষের দিকে দেখা যায়, এদের পাতার কুটির দাঙ্গার কাটাকাটি মারামারি এবং অগ্নিসংযোগের ফলে পুড়ে ছাই হয়। ফলে সরকারের তরফ থেকে লোধা শবরদের প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য একটি করে টিনের ঘর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে বর্ণিত আছে সেই টিনের ঘরগুলির কথা—

> *"টিনের ছাউনি ইটের দেওয়াল দেওয়া ঝুপড়ীর ভেতর থেকে লোকটা বেরুল।...এটা তার ঘর। এরকম আরো দু-দশটা ঘর দোরখুলির লোধাপাড়ায় নাকাবিন্ধি-পেটবিন্ধি-পাতিনার শবরপল্লীতেও আছে। খুনোখুনি কাটাকুটির বছর মহামান্য সরকার বাহাদুরই বানিয়ে দিয়েছে।"*[৭]

কিন্তু অর্থাভাবে এরা সরকার প্রদত্ত ঘরের টিন খুলে বিক্রি করে দিয়ে টিনের জায়গায় আবারও পাতা দিয়ে ছাউনি দেয়। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন—*"রাইবু লোধার ঘুপচীর চালের দুটো টিন কবে থেকে কোথায় যে উধাও হয়ে গেছে ! রাইবুর তো গেছে দুটি, আর আর লোধাদের গেছে তিনটে-চারটে।"*[৮] লোধা-শবরদের প্রত্যেকটি বাড়ির সঙ্গে একটি করে খিড়কি পথ থাকে। সেই খিড়কি পথেই চলে এদের কাজে-অকাজে, রাতে-বে-রাতের যাতায়াত। নানান জায়গায় এই খিড়কি পথের উল্লেখ রয়েছে। ঔপন্যাসিক এর বর্ননায় লিখেছেন—

> *"প্রত্যেকদিন শুকনা ডাঙায় পা ফেলে ফেলে, ঝোপঝাড় কেটে, ঘাস মেরে, মাটি চেঁছে নিজেরাই যে পথ-বানিয়েছে, সেই পথে।*
> *সে-পথ তাদের নিজেদের পথ, ধান্দার আর কান্দার। এ-পথ দিয়েই তারা ধান্দায় যায়, ঘর থেকে বেড়িয়ে এ-পথের মোড়ে বসেই তারা কাঁদে, রোদন করে।"*[৯]

পরিধান-প্রসাধন

কোনোকালে কোনোস্থানেই অভাবী মানুষেরা তাদের পোশাক পরিচ্ছেদে স্বাচ্ছন্দ্য দেখাতে পারে না। পোশাক পরিচ্ছদে আভিজাত্য দেখা যায় আর্থিকদিক থেকে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের। লোধা-শবরদের মতো অভাবীদের পক্ষে লজ্জা নিবারণের সামান্য বস্ত্রটুকুই জোগাড় করা দুঃসাধ্য। ঔপন্যাসিক এই ব্যাপারটিকে খুবই বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের সামনে তুলেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই আমারা যে দুজন লোধা-শবরদের সঙ্গে পরিচিত হই তাদের একজনের পরনে ছিল হাফ-প্যান্ট আর অপরজনের পরনে ছিল আটহাতি ধুতি। উপন্যাসের একটি মূখ্য চরিত্র রাইবু অনেকবার ভেবেছে হাট থেকে পিতার জন্য একটা চারহাতের নতুন গামছা কিনে দেবে, কিন্তু অর্থাভাবে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রাইবুর বৃদ্ধ পিতার পরনে তাই দেখা যায়, ধুতি-ছেঁড়ার নেঙট। রাইবুর পোশাকের ব্যাপারে ঔপন্যাসিক বলেছেন—*"নাঙা নাঙা। খালি যা টেনেটুনে পাছাটুকু ঢাকা লাল ডুরে গামছায়।"*[১০]

মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রেও দেখা যায় অভাবী জীবনের ছাপ। চারহাতি গামছায় যতটা পারা যায় শরীরটাকে ঢেকে রাখার প্রয়াস করে কিশোরী মেয়েরা।

লোধা পাড়ার বহির্ভূত নরসিঙা ফরেস্ট গার্ড লোধা পাড়ায় এসে দেখে, বড় বড় ছেলেগুলো প্রকাশ্যে উলঙ্গভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কিশোরীরা যাদের 'বোস' উঠেছে অর্থাৎ বুক ঈষৎ স্ফীত হয়েছে তারা লোধাপাড়া বহিভূত কেউ এলে বস্ত্রাভাবে লুকিয়ে পড়ে। মাহুল ফুল-ফল কুঁড়তে যাওয়া লোধা মেয়েদের পোশাকের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

> *"ঠেকা-পাছিয়া বগলে প্রায় উলঙ্গ দু-দুটো মেয়ে, লোধামেয়্যা, একটার ছেঁড়া-ফাটা হাফ-পেন্টুল আর কোমরে গোঁজা ততোধিক ছেঁড়া 'নুগা' কোনমতে বুকে জড়ানো, আরেকজনের এতটাই ঝিল্‌ঝিল্ গামছা, 'বোস-ওঠা' শরীরটাকে ঢেকেও ঢাকতে পারছে না, কাঠি-খুঁচিতে খুঁট আটকালে আর খুলে গেলে সে বুঝতেও পারবে না 'আছে কী নেই' ছিল কী ছিল না' এমনই ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত।"*[১১]

জীবিকা ও জীবনের পরিবর্তনের আশায় দূরদেশে যাওয়া লোধা-শবরদের পোশাক-পরিচ্ছেদে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কামিন খাটতে যাওয়া লোধাশবরেরা যেসমস্ত বাড়িতে কাজ করে সেসব বাড়ির লোকেরা এই সর্বহারাদের নগ্ন শরীর ঢাকার জন্য তাদের পুরোনো জামা কাপড় দেয়। আর এসব জামা কাপড় পেয়ে তারা আহ্লাদিত হয়ে উঠে। শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ, নাইটি, ম্যাক্সি, সালোয়ার-ফ্রকজামা ইত্যাদি যে যা পায় তা-ই এরা বেখাপ্পাভাবে নিজেদের শরীরে চড়িয়ে নেয়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়—

> *"গুরভালোধার গামছা পরা গায়ের উপর নির্দ্বিধায় উঠে যাবে ছেঁড়া-ফাটা ওভারকোট, চাঁদবদনীর শাড়ির নিচে পড়ে থাকবে সালোয়ার কামিজ, নিয়তিলোধানী শাড়ির উপরই চড়িয়ে দেবে ঝিলমিলে নাইটগাউন। কে কী পরছে কেই-বা দেখছে, কে কী বলছে কে-ইবা শুনছে—শুধু হাসাহাসি করে মরে নিজেরাই।"*[১২]

যাদের ভাগ্যে যৌবন ঢাকবার জন্য পর্যাপ্ত কাপড় জুটে না তারা দূরদেশে এসে প্রাপ্ত কাপড় বেখাপ্পাভাবে গায়ে পড়ে বেশ খুশিতে নেমে পড়ে কাজের জন্য, নয়তো বা ঘুরে বেড়ায় মেলার আলি গলিতে।

বন্ধু জিতেনের বাড়িতে গিয়ে নীলেশ্বর জিতেনের পিসিকে দেখেছে খুড়দা-শাড়ি পরা। নীলেশ্বরকে দেখে লজ্জায় মাথায় খুড়দা-শাড়ির ঘোমটা আর একটু টেনে নেয় জিতেনের পিসি। নীলেশ্বরদের লোধা পাড়ায় লজ্জায় কেউ মাথায় কাপড় তুলে নেয় না। কারণ, সেখানে লজ্জা নিবারণের পর্যাপ্ত কাপড়টুকুই নেই, তাই লজ্জা প্রদর্শনের জন্য মাথায় কাপড় তোলার প্রথা দূরদূরান্ত পর্যন্ত মাথায় আসে নি তাদের। কামিন খাটতে এসেই নিয়তি নীলিমার মুখে শুনেছে বড়দের দেখে সম্মানার্থে মাথায় কাপড় তোলা খুবই প্রয়োজন। *"গুরুজন সঙ্গে বহু লো লুগা রখিবু, মুণ্ডে।"*[১৩]

অলংকারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দোরখুলির লোধাপাড়ায় বসবাসকালে অভাবের পীড়নে যারা কোনো রকমে ছেঁড়া কাপড়ে নিজেদের লজ্জা নিবারণ করে, তারাও বসন্ত কামিল্লার কাছ থেকে সুযোগ পেলে রূপার আঙট তৈরি করে নেয়। বসন্ত কামিল্লা, যার জাতব্যবসা গহনা তৈরি করা সে লোধা-শবর নারীদের সংসর্গ পেতে গড়িয়ে দেয় ছোট ছোট পায়ের আঙট এবং কামিন খাটানোর ইন্দ্রজালে এদের নিক্ষেপ করার জন্য ওতপেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বসন্ত কামিল্লা এদের কামিন খাটানোর ইন্দ্রজালে নিক্ষেপ করতে সফল হয়। সেই ইন্দ্রজালে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে লোধা-শবর নারীদের বিশেষ কিছু অলংকার ছিল না। বনের ফুল লতা ইত্যাদিকে হাতে, মাথায়, গলায় জড়িয়ে নিজেকে সাজাতো। কামিন খাটতে গিয়েও একমাত্র চাঁদবদনীই মেলা থেকে কাঁচের চুড়ি কেনে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়— *"তারা দিব্যি হেলতে-দুলতে চুড়ির দোকানে গেল। আর কেউ চুড়ি পরবে না, ঠুনকো কাচের চুড়ি পরে তারা পয়সা নষ্ট করবে না, তাদের জঙ্গলের দুধিয়ালতাই ভালো, কেবলমাত্র চুড়ি পরবে চাঁদবদনী।"*[১৪] সহজ কথায় বলতে গেলে হতদরিদ্র লোধা-শবরেরা পেটের দু'মুঠো অন্ন জোগাড়ের জ্বালায় বুঝতে পেরেছে অর্থের মূল্য। তাই তারা চিরকাল অলঙ্কার শূন্য হয়ে থাকতে সহজেই রাজি হয়েছে।

প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এদের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিস্ফুট হয়। তসর চাষের উদ্দেশ্যে জঙ্গল লিজ নেওয়ার পর এরা আড়ায় ঢোকার নিয়ম হেতু

স্নান ও কাপড় কাচার জন্য সোডা পাউডার কেনে দোকান থেকে। বঙ্কার দোকানে আড্ডা দিতে আসা সর্বেশ্বর মাহাতো এ দেখে আশ্চর্য প্রকাশ করে বলে—*"এতদিন পয়সার অভাবে ক্ষার, চুলার ছাইয়ে লোধাপাড়ায় যে জঙলা মাটিলাগা কাপড় কাচত, আজ সে ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে গুচ্চের সোডা নিয়ে যাচ্ছে কী হেতু?"*[১৫] স্নানের ক্ষেত্রেও এরা যে একটু বেশিই অলস তা উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক। বিশেষ কোনো পূজা-পার্বণ না থাকলে এরা স্নানে অনিহা প্রকাশ করে। কিন্তু কামিন খাটতে যাওয়া লোধাদের পুকুর ইত্যাদির জলে জলকেলি করতে দেখা যায়। ঔপন্যাসিক এদের জলখেলা দেখে বলেছেন—

> *"কোথায় একদিন ছাড়া ছাড়া কাক-সিনান করত বুলান-হদদিতে, শীতের কালে মাসে একদিনও জল ছোঁয়াত কী ছোঁয়াত না দেহে, আজ তারা উদোম হয়ে গিরিহার গাড়িয়ায় জলখেলা খেলছে।"*[১৬]

কামিন খাটতে গিয়েই এরা প্রথমবার সাবান দিয়ে স্নান করেছে। এর আগে এরা হয় ছঁচ মাটি নয়তো বা ক্ষার দিয়ে মাথা, শরীর ঘষেছে। প্রসাধনের একটি অন্যতম বস্তু হচ্ছে চিরুনি ও আয়না। আয়না তো দূরস্থ থাক, লোধাদের জীবনে চিরুনিও জোটে না। এরা হাতের আঙুলগুলি চিরুনি হিসাবে ব্যবহার করে চুল আচড়ায়। উপন্যাসে শিশুবালাকে হাতের আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়াতে দেখে লেখক বলেছেন—*"জট-লাগা, বনজঙ্গলের জব্‌রা কাঠি খুঁচিভরা মাটিয়াল-চিটিয়াল চুল। আরশি-কাঁকই কোথায় যে মুখ দেখে দেখে বেশটি করে আঁচড়াবে?"*[১৭]

লোকযন্ত্র

শৌখিন আনন্দ উপভোগের জন্য নয় জীবন ও জীবিকার জন্য শিকারে প্রবৃত্ত হওয়া শবরেরা শিকার সংক্রান্ত কিছু বিশেষ লোকযন্ত্র ব্যবহার করে। যেমন-গুজিয়া, বিষমাখানো তীর, গুলতি, সাতনলা, আঠাকাঠি, ফাঁসিজাল ইত্যাদি। উপন্যাসেই জানা যায় এসব লোকযন্ত্র পাখ্‌মারা শবরদের অস্ত্র কিন্তু লোধা শবরেরাও এসবের ব্যবহার শিখেছে। শিকার এবং বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে এরা যেসব সরঞ্জাম সঙ্গে রাখে সেগুলি হল—

গুজিয়া

'গুজিয়া' নামে একটি অস্ত্রের কথা উঠে এসেছে উপন্যাসে। এই গুজিয়া দিয়ে কাঁকড়া শিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। এটি সাঁড়াশি জাতীয় লম্বা দণ্ড বিশিষ্ট একটি অস্ত্র বিশেষ। 'গুজিয়া' দিয়ে কাঁকড়া মারার কৌশলটি এই রূপ—

> *"খালধারে জল-জমিনের আল ধারে, গর্তের মুখে যেখানে জল নেই, শুধুই থকথকে কাদা আর সে- কাদার উপর যদি ছাপ থাকে কাঁকড়ার ট্যারাবেঁকা পায়ের, তবে গুজিয়া মারতে হবে ঠিক গর্তে নয়, গর্তের পাশেই। গুজিয়ার চাপে পড়ে কাঠকম্ বা কাঁকড়া বুজে-আসা নিজের গর্ত ছেড়ে উপরে উঠে আসবে। আর উঠলেই 'গুজিয়া' চেপে ধরে করাতমুখী বড় বড় দাঁড়া দুটো পটপট করে ভেঙে দাও !"*[১৮]

বিষমাখানো তীর বা কাঁড়

উপন্যাসে কোনো শবরকেই বিষমাখানো তীর বা কাঁড় ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। তবে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে শোনা গেছে লোধা-শবরেরা যুদ্ধের সময় বিষমাখানো কাঁড় ছুঁড়ে আক্রমণ করে। কুমোরপাড়ার সন্তোষ গোপনে লোধাপাড়ার সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে কুমোর পাড়ার লোকেরা বলাবলি করতে থাকে— *"দূর থেকে তাক করে যদি 'বিষমাখা' কাঁড় ছুঁড়ত? লোধারা তো ঐরকম করে বলে শুনেছি।"*[১৯] লোধাপাড়ার সাবিত্রী এবং কুমোরপাড়ার সন্তোষের প্রেম পরিণেয়ের বন্ধনে বাঁধা পড়লে সন্তোষের পরিবারের লোকেরা লোধাদের বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র এবং আক্রমণের কথা ভেবে ভীত হয়ে পরে। *"লোধারা কী কাঁড়-কাঁড়বাঁশ বিষমাখা টাঙ্গি-বল্লম তাব্‌লা-বড়তাব্‌লা নিয়ে কুম্‌হারপাড়া আক্রমণ করবে?"*[২০]

গুলতি

গুলতি দিয়ে এরা কাঠবিড়ালী শিকার করে। নীলেশ্বরের প্রসঙ্গে একস্থানে বলা হয়েছে, "*রাদ্দিন খেলা আর খেলা, গুটুল লিয়ে চিঁড়রা মারা।"*[২১]

কাঁড়-কাঁড়বাঁশ

এটি বাঁশের তৈরি এক ধরনের অস্ত্র, যা দূর থেকে নিশানা করে ছোঁড়া হয়। উপন্যাসে নীলেশ্বরের কাছে একটা কাঁড়-কাঁড়বাঁশ ছিল বলে জানা যায়। এই কাঁড়-কাঁড়বাঁশ দিয়ে সে বনের পশুপাখি শিকার করে।

এছাড়াও উপন্যাসে পাখি শিকারের জন্য শবরদের নানা ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন, আঠাকাঠি, ফাঁসগাছি, সাতনলা ইত্যাদি।

আঠাকাঠি

ক্যারকেটা বা চটি-বনি ইত্যাদি ছোট পাখি ধরার জন্যে ব্যবহৃত ফাঁদের নাম 'আঠাকাঠি'। 'আঠাকাঠি' নাম থেকে আন্দাজ করা যায় 'আঠার' ক্ষমতায় ফাঁদটিতে পাখি ধরা হয়। ভাবুর আঠা বা বীচ ফলের আঠা বাঁশের চোঙাতে এরা সংগ্রহ করে রাখে। শিকারের সময় তা বাঁশের কুঁচিতে লাগিয়ে অথবা খাল-বিলের ধারে, প্রান্তরে, ঘাসভূঁইয়ে, বাঁশঝাড়ে আঠা দিয়ে কাটাকুটি রেখার মতো এঁকে রাখা হয়। যাতে ছোট ছোট পাখির পালক আঠায় জড়িয়ে পড়ে।

সাতনলা

মাশুড়িয়া গ্রামের শবরদের পাখি-ধরার বিশেষ কায়দা-কৌশল সম্পন্ন ফাঁদের নাম হচ্ছে 'সাতনলা'। একটার পর একটা মোট সাতটা বাঁশ জুড়ে 'সাতনলা' বানানো হয়। বাঁশ নলের মুখে লোহার শিক লাগিয়ে উঁচু ডালে বসা ঘুমন্ত পাখিকে শিকে গেঁথে অথবা অশথ আর মনসা গাছের রস সর্ষে তেলের সঙ্গে ফুটিয়ে আঠা বানিয়ে সেই আঠা নলের মাথায় লাগিয়ে পাখি ধরা হয়। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যেও পাখি ধরার এইসব ফাঁদের উল্লেখ রয়েছে। মনসার জাগরণ পালায় আছে–

"আঠা কাঠি সাতনলা লৈয়া জাল দাড়ি
শিকার করিতে তারা বন গিয়া বেড়ি।।"[২২]

কুঁচিফাঁস

এই ফাঁস কপতি ধরার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যা ঘোড়ার কিংবা গরুর লেজের মোটা চুল দিয়ে তৈরি হয়। 'ফাঁসগাছি'র তারের মত মোটা চুলগুলি লোধা-শবরদের নিজস্ব সম্পদ নয়। এটি আক্‌খুটি শবরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত। উপন্যাসে কথিত আছে, কোনো এক সময় শীতকালীন মরসুমে পুবদেশ থেকে এক 'আক্‌খুটি' শবর ফকিরের ছদ্মবেশে লোধা-শবরদের পাড়ায় ভিক্ষা চাইতে এসেছিল। রাইবুর বাবা গেঁড়া শবর সেই ছদ্মবেশী ফকিরকে বলেছিল, *"হামরাই দিন-ভিখারীর জাত, তো ফকিরবাবাকে ভিখ্ দিব-অ কুথাল্লে! নাহ্-অ বাবা এ হ্-অ বাবা! ভিখ্ দিই না দিই তুমার ঐ চামর থেকে একগোছা চুল দেও ফকিরবাবা, ফাঁস বানাব।"*[২৩] গেঁড়া শবরের এই আবদারে বাবা তাকে তার চামর থেকে একগুচ্ছ চুল দিয়েছিল খুশী মনে। রাইবুর বাবা সেই উটের না গাধার চুল দিয়ে বানিয়েছিল এই কুঁচিফাঁস। *"বাঁশবাউশের কুঁচি বেঁকিয়ে, গোল গোল দরজার মতো করে, সুতো দিয়ে বর্‌ফির মতো বেঁধে তার মধ্যে আলগা গিঁট দেয়া চুলের ফাঁস।"*[২৪] পাখিরা চরতে চরতে বেমালুম গলা লাগিয়ে দেয় মরণ ফাঁদে। আর গলা দেওয়া মাত্রই চুলের ফাঁসে ঝুলে পড়ে।

ফাঁসগাছি

ফাঁসগাছি মাছ মারার ফাঁসি জালের মতো একধরণের পাখি মারার জাল। দীর্ঘ এই জাল ঝোপ-ঝাঁড়ে কিংবা জলাশয়ের আশেপাশে বিস্তীর্ণ স্থানে মেলে দিয়ে পাখি ধরা হয়। উপন্যাসে রাইবুকে দেখা যায় পাখি মারার জন্যে ফাঁসগাছি হাতে নিয়ে জঙ্গলে বেরিয়ে যেতে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য *"খাপে খাপে খাঁজে খাঁজে গোটানো ফাঁসগাছটা ধীরে ধীরে ডুবকার চারধারে পেতে চলেছে রাইবু। পরতের পর পরত। ফুরোয় না আর ফুরোয় না। এতবড় ফাঁসগাছি লোধাপাড়ায় আর কারোরই নেই।"*[২৫]

লোকবাদ্য

উৎসব-অনুষ্ঠান, ব্রত-পূজা বিপদ-আপদ এমনকি যুদ্ধেও লোকসমাজে বাদ্যের ব্যবহার হয়। লোধা-শবরদের জীবনে বাদ্যের উপকরণ সীমিত। উৎসব-

অনুষ্ঠান, ব্রত বা পূজার দিনে বিনোদনের জন্য এরা চাঙু এবং তরলবাঁশের বাঁশি বাজিয়ে নাচ করে।

চাঙু

'চাঙু' শবরদের প্রায় ঘরে দেখতে পাওয়া যায়। এটি গোলাকার কাঠের পাতের তৈরি। যার একদিক চামড়া দিয়ে ঢাকা আর অপরদিকটা খোলা। এতে জায়গায় জায়গায় দু-চারটে ঘুঙুর বাঁধা থাকে। বাদক বিশেষ কায়দায় এটিকে বাজায়। কেউ কেউ আবার ডান হাতের কব্জিতে এক ছড়া ঘুঙুর বেঁধে চাঙু বাজায়। মূলত হাতের বুড়ো আঙুল দিয়েই চাঙু বাজানো হয়। গ্রীষ্মকালে 'চাঙু'তে বাঁধা চামড়া টানটান থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে চামড়া ঢিলে হয়ে যায়। তাই বর্ষাকালে তা আগুনে সেঁকে বাজাতে হয়। নয়তো ভালো আওয়াজ আসে না।

তরলবাশের বাঁশি

বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় তরল বাঁশের বাঁশি। বিশেষ কায়দায় ফুঁ দিলে তা বেজে ওঠে। বাদক নিজের মতো করে এতে সুর তোলে।

পাতার বাঁশি

সোনালগাছের পাতা চিরে দু'ভাঁজ করে, তাতে কাঠি গুঁজে, কাঠিখুচির একদিকে পাতার একপাল্লা আর একদিকে আররেক পাল্লা জড়িয়ে, ফুঁ দিয়ে শিস বাজানোর একটা বিশেষ কায়দা রয়েছে লোধা শবরদের।

গৃহস্থালি দ্রব্য

'শবরচরিত' উপন্যাস থেকে শবরদের ঘরে ব্যবহৃত নানান গৃহস্থালি দ্রব্যের কথা জানা যায়। বিত্তবানদের মতো বিত্তহীন শবরদের ঘরে মূল্যবান সম্পদ কিছুই থাকে না। এদের ঘরে যেসব গৃহস্থালি দ্রব্য দেখা যায় তা আর্থিক দিক থেকে নিতান্তই সামান্য মূল্যের; তবে ব্যবহারিক দিক থেকে এগুলি শবরদের কাছে মহামূল্যবান। শবরদের ব্যবহৃত গৃহস্থালির বিবরণ দেওয়া যাক—

চাটাই

খাট-পালঙ্কে ঘুমানোর সাধ্য এদের নেই। এরা ঘুমায় নিজেদের হাতে বোনা খেজুর পাতার চাটাই-এ। উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে চাটাইয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। যেমন—*"খাওয়া সেরে বাহির-ঘরে খেজুরপাতার চাটাই বিছিয়ে বড় আরামে শুয়ে"*[২৬] থাকে রাইবু মন্মথের ঘরে।

পাছিয়া

এটি বাঁশের তৈরি ঝুড়ি বিশেষ। গরুর গোবর সংগ্রহের জন্য এরা পাছিয়ার ব্যবহার করে। উপন্যাসে কথিত আছে—*"শারাবণ শবরের মেয়ে চাঁদবদনী একটা ভাঙা পাছিয়া নিয়ে সেই দুপহর থেকে গরুর গোঠের পিছন পিছন ঘুরছিল।"*[২৭]

পিঁড়া

পিঁড়া বা পিঁড়ি হল কাঠের তৈরি নিচু আসন বিশেষ। এর উচ্চতা এক-দেড় ইঞ্চি থেকে শুরু করে আট-দশ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। 'শবরচরিত' উপন্যাসে একটি উঁচু পিঁড়ার উল্লেখ রয়েছে, যে পিঁড়া ঘরের বারান্দায় রেখে নুকু ও তার বোন বসে বসে পা ঝুলিয়ে পাকা মাদাল ফল খায়।

বাটনা-বাটা

বাটনা বাটা বা শিল-নোড়া পাথরের তৈরি মসলা বাটার একটি সরঞ্জাম। হেঁশেল সামলাতে গিয়ে প্রায় সব সমাজেই এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। লোধাশবরেরাও হেঁশেলে এর ব্যবহার করে থাকে। রান্নাবান্নার কাজে এটি তাদের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। তাই দূরদেশে কামিন খাটতে যাবার সময় ভারি বাটনা বাটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারায়, এটিকে অতি যত্নে ঘরের মেঝের মাটি খুঁড়ে পুঁতে রেখে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। মশলা বাটার শিলনোড়া শুধু যে তাদের হেঁশেলেই ব্যবহৃত হয় তা নয় এটিকে তারা দরজা লাগাবার কাজেও ব্যবহার করে।

নেশাদ্রব্য

বিড়ি খাওয়ার একটা প্রবৃত্তি লোধা-শবর পুরুষদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এরা আমোদ-আহ্লাদে, চিন্তায়-বিপদে শালপাতার চুটা বা বিড়ি খায়। একটা চুটা বা বিড়িকে এরা কয়েকজন মিলে ভাগাভাগি করে খেতে পছন্দ করে। বিড়ি হাতে তৈরি সস্তা ধুমপানের সামগ্রী। সিগারেটের তুলনায় প্রচুর কম দাম এবং যখন তখন হাতে বানানো যায় বলে দরিদ্র এবং প্রত্যন্ত এলাকায় ধুমপানের সামগ্রী হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়। এতে তামাক পাতার গুড়ো থাকায় মানবদেহকে এটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবুও এটি প্রাচীন সময় থেকে ধূমপায়ীদের কাছে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে। বিড়ির নেশা লোধাদের মনকে এতটাই অধিগ্রস্থ করে নিয়েছে যে—*"বিড়ির কথা মনে আসতে ভুবনের কানে হাত।...একেই বলে মানুষ অভ্যাসের দাস। এত থাকতে কানের ভাঁজ কুটকুট করে কেন? না আধপোড়া বিড়ি কানের খাঁজে গুঁজে রাখা ভুবনের স্বভাব, হাত আপনার মনে উঠেও যায়।"*[২৮]

মহুল রসের মদ

মহুলের রস দিয়ে এক ধরনের মদ তৈরি করা হয় যা লোধা-শবরদের একটি বিশেষ নেশা দ্রব্য হিসেবে চিহ্নিত। এই মদ আগুনে জ্বাল দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে চুঁইয়ে জমানো হয়। তাই একে চুঁয়ানি মদও বলা হয়।

দোক্তাবনা

দোক্তা হল শুকনো তামাকপাতার চূর্ণবিশেষ। মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে দোক্তাবনার নেশা শবরসমাজে প্রচলিত। তবে দোক্তাবনা নেশার প্রবণতা মহিলাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি লক্ষ করা যায়। এরা নিজের হাতে 'তসর-ঠয়া' দিয়ে দোক্তাবনা রাখবার কৌটো তৈরি করে। ছোটো বড় দুটি তসর ঠয়া মাঝ বরাবর কেটে তসর পুতলী ফেলে ছোট তসর-ঠয়ার সঙ্গে বড় তসর-ঠয়া আটকে দিয়ে দোক্তা এবং চুন রাখার চমৎকার কৌটো বানানো হয়।

বাক্‌কেন্দ্রিক সংস্কৃতি

ছড়া— লোধা-শবরদের মধ্যে প্রচলিত, বেশ কিছু ছড়ার সন্ধান উপন্যাসে পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রত্যেকটি যে লোধা-শবরদের নিজস্ব সৃষ্টি তা নয়। কিছু কিছু তাদের প্রতিবেশী জনজাতির কাছ থেকে প্রাপ্ত ছড়াও রয়েছে। উপন্যাসের শুরুর দিকে একটি ছড়া শুনতে পাওয়া যায় রাইবুর সাকরেদ গুড়গুড়িয়ার মুখে—

"রাম-লখোন দুই ভাই।
বাণ মারে ঠুই ঠাই।"[২৯]

এই ছড়াটি কোন জনগোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্ট তা বিচার করতে গিয়ে শবরদের পরিচয়ের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। উপন্যাসের বিশিষ্ট চরিত্র ফুলটুসির কথা অনুযায়ী রামায়ণে কথিত শবরীর বংশধর হচ্ছে আজকের লোধা-শবরেরা। সেদিক থেকে বিচার করলে এই ছড়াটি লোধা-শবরদের নিজস্ব সৃষ্টি বলে মনে করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় যে ছড়াটি উপন্যাসে শোনা গেছে সেটি লোধা-শবরদের মুখে শোনা গেলেও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও এরকম ছড়ার প্রচলন দেখা যায় । ছড়াটি এই রকম—

"কী অত কথা ?
ব্যাঙের মাথা।
কী ব্যাঙ ?
টুরি ব্যাঙ।
কি করে ?
টুর-টুরায়, আর টুর-টুরায়।"[৩০]

এটি 'ছড়া কাটা খেলা' রূপে বঙ্গসমাজে প্রচলিত। এই ছড়ার অনুরূপ একাধিক ছড়া লোকসমাজে দেখেতে পাওয়া যায়।

বনে বসবাসকারী লোধারা বনে বনে পথ সৃষ্টি করে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে যায়। হেঁটেই এরা পথ অতিক্রম করে নেয় নির্দ্বিধায়। দূরের আত্মীয়দের

বাড়ি পায়ে হেঁটে যেতে প্রচুর সময় লেগে যাওয়ায় এরা পথমধ্যে খাদ্য হিসেবে যা পায় তা-ই খেয়ে নেয়। সে তা, গাছের ফল-মূলই হোক আর বনের পশু-পাখিই হোক। এই সম্পর্কিত কিছু ছড়ার প্রচলন রয়েছে লোধা সমাজে। অতিথি আগমনে এরা ঠাট্টায় এই ছড়া বলে থাকে-

"বনে বনে আইলি বাবু, কী খাঞে আইলি?
পেট্‌টা ত ডাবাক-ডুবুক রে বাবু শিয়াড় গিলে আইলি?
এত কেনে দেরি বাবু, এত কেনে দেরি?
তোর বহিন বাহিরাঁই গেল, ভাত দিতে দেরি...।"[৩১]

অন্যান্য জনজাতির জীবনের প্রসঙ্গ তুলে মশকরা করার জন্যে এরা কিছু ছড়ার ব্যবহার করে। এমনই একটি ছড়া হল-

"ঘোষের ঘরে রসের পিঠা খেতি কাঁকড়ার ঝোল।
কাই থাইলা রে মিরধা বাঁদর দিলা হরিবোল।।"[৩২]

লোধা-শবরদের মধ্যে বেশ প্রচলিত একটি ছড়া হচ্ছে 'তারা গনা' ছড়া। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'তারা গনা খেলা'র ছলে এই ছড়াটি মুখে মুখে বলে থাকে—

"একটা তারা দুইটা তারা বাভন ঘরের ঝারা পারা,
দাও ত মাসি কাঁড়বাঁশটা বিঁধে দিব ভারভুরটা।"[৩৩]

সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, জন্মের সাথে সাথে মানুষের ভাগ্যও লিখিত হয়। মানুষের জীবনে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটে তার সবকিছু পূর্ব নির্ধারিত। মানুষ তার ভাগ্যকে কোনোভাবে পরিবর্তন করতে পারে না। ভাগ্যে যা আছে মানুষকে তার মুখোমুখি হতে হয়। মানুষের এই ভাবনা থেকেই তৈরি একটি ছড়া—

"কাঁদিলে কী হবেক রানী।
ভাবিলে কী হবেক।
যখন জনম তখন লেখন লো রানী।
এখন কেনে কান্দিস? [৩৪]

এই ছড়াটিকে তারা তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে। প্রত্যহের ভারকে হালকা করতে এরা এই ছড়াটি আওড়ে নেয়।

যে ছড়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছেলেভুলানো বা মেয়েভুলানো ছড়া হিসেবে প্রচলিত, সে ছড়া শবর মেয়েরা দোলা খাবার সময় গীতের মতো গায়—

"দোল্ দোল্ দোলুনি রাঙা মাথায় চিরুনি।
বর আসবে এখুনি লিঞে যাবে তখুনি—"[৩৫]

প্রবাদ-প্রবচন

জীবন, জীবিকা ও পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা নানা ধরনের প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায় উপন্যাসের লোধা-শবরদের মুখে। বনে জঙ্গলে বসবাসকারী লোধাশবরেরা আত্মরক্ষা ও শিকারের জন্যে হাতিয়ার হিসেবে শর ব্যবহার করে। তাই 'শর'-এর সঙ্গে এদের সম্পর্ক গভীর। আর এই সুবাদেই 'শর' স্থান পেয়েছে এদের প্রবাদে। শিকারের উদ্দেশ্যে বের হওয়া রাইবু এবং গুড়গুড়িয়ার মুখে শোনা যায় শর নিয়ে একটি প্রবাদ। প্রবাদটি গুড়গুড়িয়া বলেছিল রাইবুকে খুশী করার জন্য। শিকারের অনিশ্চয়তার গ্লানি কাটানোর জন্যে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়—

"যেখানে শর সেখানে শবর।"[৩৬]

বনবাসী শবরদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তাদের এই অত্যন্ত উপযোগী অস্ত্রটি উঠে এসেছে এদের প্রবাদে।

শবরদের জীবনপথ সরল নয়, এদের জীবন আঁকা-বাঁকা পথে ভরপুর। দারিদ্র্যের প্রকোপে পড়ে এদের কখনো কখনো চৌর্যবৃত্তির পথেও চলতে হয়। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য শবরেরা সোজা পথে চলার চেষ্টা করলেও প্রশাসন কিন্তু তা বিশ্বাস করে না। বরং লোধা পাড়ার আশপাশের যেকোনো জায়গায় যেকোনো ধরনের অপরাধ হোক না কেন, প্রশাসনের ক্রূর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে লোধা-শবরদের পাড়াতেই। তাই চুরি হোক, ডাকাতি হোক, লুঠ হোক বা যেকোনো ধরনের

অপকার্য হোক লোধাপাড়ায় শুরু হয়ে যায় পুলিশী হানা। ব্রিটিশ রাজত্বকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তাদের এই অভিজ্ঞতা অক্ষত, তাই লোধা সমাজে এটি প্রবাদাকারে প্রচলিত—

"ধান খাইল শুঁড়ির ষাঁড়ে, পড়ল বামাল তাঁতির ঘাড়ে?
চুরি হৈল যথাতথা, চোর ঢুঁড়তে লোদ্ধাপাড়া।"[৩৭]

উপন্যাসে এই প্রবাদটি একাধিকবার শোনা গেছে। চুরি ডাকাতি ছাড়াও সাঁওতাল কিশোরীর ধর্ষণকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতেও বিনা দোষে পুলিশী হানা পড়ে লোধাপাড়ায়। এ শুধু লোধাদের ব্যাপার নয়, সমাজে এরূপ ঘটনা হামেশাই চোখে পড়ে। একই সমাজে বসবাসকারীদের মধ্যে যারা আর্থিকদিক থেকে অথবা সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে সবচাইতে পিছিয়ে পড়া কিংবা দুর্বল তারা প্রশাসনিক এবং সামাজিক দিক থেকে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হয়।

জঙ্গলমহলের জনপদে বসবাসকারী সাঁওতাল, তাঁতি, মাহাতো, ভূমিজ সকলেরই চাষাবাদের কিছুনা কিছু জমিজমা আছে। তা একমাত্র শবর লোধাদের নেই। এই নিয়ে তাদের জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। এদের ধারণা, ঈশ্বর তাদের চাষবাসের সুযোগ করে দিয়েছিল কিন্তু তারাই তা ধরে রাখতে পারেনি। ঈশ্বরপ্রদত্ত চাষবাসের সহায়ক হিসেবে পাওয়া বলদটিকে তারা খিদের জ্বালায় খেয়ে ফেলেছিল। তাদের ধারণা সেই অপরাধেই ঈশ্বর তাদের অভিশাপ দিয়েছেন জন্মেও তারা চাষবাস করে উঠতে পারবে না এবং এ থেকেই এদের জমিজমা ও চাষবাসের সমস্যা অন্তহীন হয়ে উঠেছে। এই জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারেই এদের সমাজে প্রচলিত একটি প্রবাদ—

"কপালে নাইক ঘি, ঠকঠকাইলে হবেক কি?"[৩৮]

এই প্রবাদটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য সমাজেও ব্যবহৃত হয়। যে কোনো কাজে অসফল হলেই মানুষ এই প্রবাদটি ব্যবহার করে। আসলে, মানুষ জীবনে যখনই কোনোকিছু পাওয়ার জন্যে ভীষণভাবে চেষ্টা করে এবং বারবার সেটির থেকে

বঞ্চিত হয় তখন তার মনের ভীষণ ক্ষোভ থেকে এই প্রবাদটিই উঠে আসে। এই প্রবাদটির অর্থ এই যে, যা ভাগ্যে নেই তা পাওয়ার জন্যে শত চেষ্টা করেও লাভ নেই। আসলে যে কোনো মানুষই বারবার চেষ্টা করার পরও যখন অকৃতকার্য হয় তখন অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করে মানসিক প্রশান্তি খোঁজের চেষ্টা করে। আর এ থেকেই উক্ত প্রবাদের সৃষ্টি।

উপন্যাসে চাষবাদের জন্যে জমিজমা না থাকায় শবরেরা আশা করে সরকারের কাছ থেকে জঙ্গলের একটি অংশ তসর চাষের জন্যে লিজ পাবে। চাষীরা যেমন চাষের জন্য উপযুক্ত জলবায়ুর আশায় বুক বেঁধে থাকে; অথচ তারা ভালোভাবেই জানে যে, জলবায়ুর ব্যাপারটা সম্পূর্ণই প্রকৃতির নিজস্ব ব্যাপার। তেমনি তসর চাষের জন্য জঙ্গল লিজ নিতে চাওয়া আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল শবরেদের বুক বেঁধে বসে থাকাও একই কথা। এই প্রসঙ্গের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এদের সমাজে প্রচলিত হয়ে উঠেছে একটি প্রবাদ-

"আশায় মরে চাষা।"[৩৯]

শবরেরা ভালোভাবেই জানে সরকার বাহাদুর এদের উপর মেহেরবান না হলে জঙ্গল লিজে পাওয়া সম্ভব নয়, তবুও এদের আশা থেকে যায়, ধার-দেনা যা করেই হোক লিজ নেবেই।

জঙ্গলমহলের বাসিন্দা শবরেরা পঞ্জিকা দেখে দিন গণনা করে চলে না। শুধুমাত্র পাঁজি-পঞ্জিকা রাখার সামর্থ্য নেই বলে নয়, এদের কাছে পঞ্জিকা নেই কারণ এরা এটাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না। বরং এরা মনে করে দিন-কাল সমস্তই এদের নখদর্পণে। দিন-কাল-মাস-ঋতু-পূর্ণিমা-অমাবস্যা সমস্তই করে হাতের আঙুলের কড় গুনে। অথবা ছঁচমাটি দিয়ে লেপা দেওয়ালে রেখা কেটে এরা হিসাব করে। এছাড়া বনের ফুল-ফল, শাক-সব্জী, প্রকৃতির রূপের বাহার, জলবায়ু-আবহাওয়া ইত্যাদি দেখেও এরা মাসের হিসেব বের করে নেয়। তাই এদের

জীবনে যে পাঁজি-পঞ্জিকার তেমন একটা গুরুত্ব নেই তা নিয়ে একটি প্রবাদের প্রচলন রয়েছে—

"যতই দেখ পাঁজি-পুঁথি আষাঢ় মাসের সাতদিনে হয় অম্বুবাচী।"[৪০]

'অম্বুবাচী' হিন্দুধর্মের একটি বাৎসরিক উৎসব। লোকবিশ্বাস অনুসারে আষাঢ় মাসের সপ্তম দিন থেকে ধরিত্রী মাতার ঋতুস্রাব হয়। পাঁচদিন ধরে এই ব্যাপারটি সংঘটিত হয়। আর এই বিশেষ দিনগুলি বর্ষা মুখরিত হয় বলে এদের ধারণা। লোকসমাজের লোকেরা এসময় কোনো ধরনের মাঙ্গলিক কার্যে হাত দেয় না। এর পাশাপাশি এই সময় হাল ধরা কিংবা মাটি খোঁড়াও নিষিদ্ধ। তাই এই বিশেষ দিনগুলিকে মনে রাখার তাগিদ থেকেই এদের মুখস্থ হয়ে আছে, আষাঢ় মাসের সাতদিনে অর্থাৎ সপ্তম দিনেই অম্বুবাচী হয়।

নানান সময়ে নানান কারণে অথবা কখনো অকারণে লোধা-শবরদের জেল যেতে হয়। জঙ্গল আইনের পর নির্ভয়ে জঙ্গলে চলাচল করার জন্যে ফরেস্ট গার্ড যেমন কখনো কখনো বনসম্পদ চুরির দায়ে তাদের ধরে থানায় চালান করে দেয় তেমনি নানান সময় গৃহস্থের ঘরে চুরি ডাকাতি করার সন্দেহে প্রশাসন এদের হাজতে পুরে। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এদের নামে কোনো রূপ কেস তৈরি না করে এদের এভাবেই আটকে রাখা হয়। এরা বিচারকের কাছে কোনো রূপ বিচার পায় না। বিনা বিচারেই এরা হাজতে পড়ে পড়ে জীবন অতিবাহিত করে। আইন সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় এবং কোনোরূপ জরিমানা দিতে সক্ষম না হওয়ায় এদের সেখান থেকে রেহাই পাওয়া আসম্ভব হয়ে ওঠে। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লোধা-শবর সমাজে হাজত সম্পর্কিত একটি প্রবাদ তৈরি হয়েছে—

"যে যায় হাজতে তাকে খায় যমদূতে"[৪১]

অর্থাৎ, যে একবার হাজতে যাবে মৃত্যুর আগে তার কোনোভাবেই রেহাই সম্ভব নয়, আমৃত্যু তাকে থাকতে হবে জেলে। কখনো হয়তো দোষে আবার কখনো বা বিনা দোষেই।

জেল-হাজতের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকে মাথায় রেখে আর একটি প্রবাদ উঠে এসেছে লোধাশবর কুশীলবদের মুখে। বন-জঙ্গলে বসবাসের সূত্রে লোধা-শবরেরা প্রায়ই বনের হিংস্র জীব জন্তুর মুখোমুখি হয়। জীব জন্তুদের মধ্যে বাঘের পাল্লায় পড়লে মানুষের চরম ক্ষতি। কিন্তু এরা পুলিশী ব্যবস্থাকে এই বিপদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছে, বাঘের পাল্লায় পড়ে জখমী বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার চেয়ে পুলিশের পাল্লায় পড়লে মানুষ আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রবাদে বলা হয়েছে—

"বাঘ ছুঁলে আঠারো ঘা।
পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।।"[৪২]

জেল-হাজত, প্রশাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে অর্জিত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আর একটি প্রবাদের প্রচলন ঘটেছে লোধা জনসমাজে। প্রশাসন ব্যবস্থা কখনো কখনো তদন্তের নামে বিস্তর সময় ব্যয় করে সাধারণ মানুষের জীবনে নিয়ে আসে চরম দুরবস্থা। কোনো ঘটনার তদন্ত এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এতটা সময় ব্যয় করে যে, দিন এনে দিন খাওয়া সাধারণ মানুষেরা ন্যায় বিচারের আশায় থানায় চরকীর মত চক্কর কাটতে কাটতে নিঃশেষ হয়ে যায় তবুও বিচার হয় না। এই অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের মনে গভীর দাগ কেটে প্রবাদ হয়ে ফুটে উঠেছে এভাবে—

"খুন না আত্মহত্যা?
ততদিনে চাষবাসের রফা-দফা।।"[৪৩]

আমাদের সমাজে এমন অনেক সুবিধাভোগী মানুষ আছে যারা দরকারের সময় বন্ধুত্ব করে কাজ হাসিল করে নেয় এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ভুলে যায়। অর্থাৎ কাজের সময় একরকম ব্যবহার এবং কাজ হাসিল হয়ে গেলে আর এক রকম ব্যবহার। সুবিধাভোগী মানুষদের এই ব্যবহারকে কেন্দ্র করে নানান সমাজে নানান ধরনের প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—

"কাজের বেলায় কাজী

কাজ ফুরালে পাজী।।"[৪৪]

এই প্রবাদটি লোধা-শবরদের মুখে মুখেও প্রচলিত। এই একই অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি আর একটি প্রবাদও এদের মুখে শোনা যায় যার শব্দগুলি ভিন্ন কিন্তু অর্থ একই—

"কাজের বেলায় গলায় মালা।
কাজ ফুরালেই ঢ্যামনা-শালা?"[৪৫]

জীবনোপলোব্ধিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ এক সময় ভালোভাবেই বুঝে উঠতে পারে জীবন সুখ-দুঃখে মিশ্রিত। জীবনে দুঃখ এলে মানুষ সেই দুঃখে কাতর হয়ে যায় এবং বাকি জীবনটাও হয়তো দুঃখে কাটতে পারে সেই আশঙ্কায় আরো ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবন অভিজ্ঞতায় জ্ঞানী ব্যক্তি তখন বিপদে পড়া সেই ব্যক্তিকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, জীবনে দুঃখের পর সুখের আগমন ঘটে। আসলে মানুষ আশাবাদী। জীবনে যাই ঘটে যাক না কেন মানুষ আশা করে তার জীবন একদিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এই আশা থেকে তৈরি একটি প্রবাদ—

"রহিস বিটি সহে, সকল যাবে বহে।"[৪৬]

হাসি-কান্নায় গড়া জীবন হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়ার উপদেশ দিয়ে তৈরি হয়েছে আরেকটি প্রবাদ। যেই প্রবাদে বলা হয়েছে, জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, তাই দুঃখে ডুবে না গিয়ে হেসে-খেলে আনন্দ করে জীবন কাটানো উচিত।

"লাচ গ বিটি লাচ। খেল গ বিটি খেল—ই জীবন গ বিটি আড়াই দিন!"[৪৭]

অরণ্যে বাস করেও অরণ্যে যাদের বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। নিজ বাসভূমির আশেপাশে কাজ খুঁজতে গেলেও যাদের কাজ দেওয়া হয় না। যাদের প্রতিনিয়ত চোর বলে অপবাদ দেওয়া হয়। যাদের পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলে সেই সমস্ত লোধা-শবরদের মুখে শোনা যায়—

"পেটে ভাত নাই যার, জাত নাই তার।"[৪৮]

জাতের বিচারে লোধাশবরেরা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণের থেকে উঁচু বলে বিচার করে। জাত্যভিমানের দিক থেকে এরা কিছু কম নয়। কিন্তু জঙ্গল আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর অরণ্য সম্পদ থেকে এরা যখন বঞ্চিত হয়, তখন এদের একটি মাত্র ঝুপড়ি তোলার মতো বাস ভিটাটুকু ছাড়া আর কিছু সম্বল থাকে না এবং মাথায় চোরের কলঙ্ক এসে পড়ায় এরা দিন-দিন অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। পেটের ক্ষুধা তখন জাতের উপর যেতে পারে না। যতই জাত্যাভিমান থাকুক না কেন এরা বলতে বাধ্য হয়— পেটে যাদের ভাত নেই তাদের জাত নিয়েও কোনো মাথা ব্যথা নেই।

বনে বসবাস করলে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শুধু যে বন্য পশু-জীবজন্তু লোধাদের একমাত্র সমস্যা তা নয়। বন্য জীবজন্তুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝা, দাবানল ইত্যাদি সমস্যাও রয়েছে। কিন্তু লোধাদের সমস্যা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। অরণ্যে বসবাসকালে লোধারা ফরেস্ট গার্ডের দ্বারা বারে বারে তাড়িত হয়। লোধাদের ভগ্ন প্রায় পাতার কুটিরগুলোতে বার বার নানান অজুহাতে হানা দেওয়া হয়। পুলিশ লোধা পুরুষদের ঘরে পেলে হাজতে পুরে দেয়। এই ভয়ে যখন সমস্ত লোধা পুরুষেরা ঝুপড়ি ছেড়ে পালায় তখন লোধা নারীদের উপর শুরু হয় পুলিশী অত্যাচার। বিশেষত নারীদের উপর অত্যাচার করার উদ্দেশ্যেই লোধাপাড়ায় পুলিশ রাতের বেলা হানা দেয়। বন্য জীবজন্তুর আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পুলিশী হানা এই ত্রিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে হাঁপিয়ে ওঠা লোধাদের সবসময়ই মনে হয়—

"বনের মধ্যে বাস, ভাবনা বারোমাস।"[৪৯]

এর অনুরূপ আর একটি প্রবাদ লোকসমাজে প্রচলিত রয়েছে। যারা নদীর ধারে বসবাস করে বিশেষত তাদের মুখে এই প্রবাদটি শোনা যায়-

"নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারোমাস।"

তবে নদীর তুলনায় আলোচ্য উপন্যাসে শবরদের পক্ষে বনে বাস করা বেশী

সমস্যার বলে দেখানো হয়েছে। এমনই প্রত্যেকটি প্রবাদের মধ্যে রয়েছে সমাজ অভিজ্ঞতা, মানব মনস্তত্ত্ব এবং জীবন জিজ্ঞাসার দার্শনিক সমাধানের ইঙ্গিত।

ধাঁধা

লোকসাহিত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল ধাঁধা। ধাঁধা প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক এক ধরনের খেলা। এতে দুই পক্ষের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী। একটি পক্ষ প্রশ্ন কর্তা এবং অপরটি উত্তরদাতা। এই দুই পক্ষ ব্যতীত ধাঁধা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ধাঁধার মধ্যদিয়ে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা উভয়েরই বুদ্ধির বিচক্ষণতা পরিদর্শিত হয়। ধাঁধা গদ্য এবং পদ্য দুই রীতিতেই রচিত হয়ে থাকে। তবে পদ্যের মধ্যদিয়ে শ্রোতারা ধাঁধার রস আস্বাদন করে বেশী আনন্দিত হয়। অঞ্চলভেদে ধাঁধার বিভিন্ন নাম ভেদ দেখা যায়। যেমন— প্রহেলিকা, হেঁয়ালি, ঢক, ছিলকা, শিলুক, ভাঙ্গানী, দিঠান, দস্তান, শিমাসা ইত্যাদি।

'শবরচরিত' উপন্যাসে লোকসমাজে প্রচলিত বেশ কিছু ধাঁধার উল্লেখ রয়েছে। যা কখনও ভাঙানি, কখনও হেঁয়ালি, কখনো সুলুক আবার কখনো ঢক বলে পরিবেশন করা হয়েছে। উপন্যাসে আমরা দেখি শবর সমাজের ছেলেমেয়েরা অবসর সময়ে একত্রে বসে খেলার ছলে ধাঁধার মাধ্যমে একে অপরের বুদ্ধির পরীক্ষা করে। উপন্যাসে ব্যবহৃত কয়েকটি ধাঁধা এখানে তুলে ধরা হল—

১) "এক থালা সুপারি গুনতে নারি।"[৫০]

উত্তর: তারা

২) "জলপাঁড়কা জলপঁড়কা
জলের তলে বাসা,
হাড় নাই চাম নাই
'মাস'টা বেড়ে খাসা—"[৫১]

উত্তর: বাগদা চিংড়ি

৩) "তিন কুনিয়া পোখরে ন্যাকড়া ভাসে।
পিছুতে কাঠি দিলে ফিক্ ফিক হাসে।।"[৫২]

উত্তর: প্রদীপ

৪) "আস দেওর কাজ করবে দু-জাঙের মাঝে।"[৫৩]

উত্তর: জাতা

৫)"উপরন্যু পড়ল তারা ভুঁই থর্ থর্ করে।
সোনার নূপর ভাইঙে গেল কে জুড়তে পারে।।"[৫৪]

উত্তর: বাজ পড়া

৬) "তেল চুক্ চুক্ পাল্হা, ফলে ধরে কাঁটা।
পাকলে মধুর মুজি গোটা গোটা।।
যে নাই বলতে পারে সে হৈল পাঁঠা। পাঁঠা পাঁঠা—"[৫৫]

উত্তর: পড়াশ/কাঁঠাল

৭) "বন থাকতে আসছে বীর কুড়হার কাঁধে করে।
নাইকো এমন বাপের বেটা তাকে ধরে মারে।"[৫৬]

উত্তর: ছায়া

৮) উপোরন্যু পড়ল দুম্।
দুম্ বলে মোর পঁদ সুঙ।।"[৫৭]

উত্তর: পাকা তাড়/ পাকা তাল

লোধাসমাজে ধাঁধার প্রচলন থাকায় অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচলিত বেশকিছু ধাঁধা সমাধানে এরা সক্ষম হয়। এবং নিজেরাও ধাঁধার আসরে সে সব ধাঁধা প্রয়োগ করে। যেমন—

"কাঁচায় তুলতুল পাকিলে সিঁদুর।
যে নাই বলেতে পারে তাঁর বাপ উঁন্দুর।।"[৫৮]

উত্তর: মাটির হাঁড়ি

এই ধাঁধাটি প্রথম শোনা যায় ব্রাহ্মণ কুমোরের মুখে। ধাঁধাটি মূলত কুমোর সমাজের সঙ্গেই জড়িত। এই ধাঁধাটি ব্রাহ্মণ কুমোর তার সখা রাইবু লোধাকে ভাঙাতে দিয়েছিল। পরবর্তীতে এই ধাঁধাই শবর ছেলে মেয়েদের ধাঁধার আসরে শুনতে পাওয়া যায়।

এছাড়া বিভিন্ন জনজাতিদের মধ্যে প্রচলিত ধাঁধার উত্তর দিতেও দেখা গেছে লোধা-শবরদের। যেমন—

"লাচ্ মেনাঃ তায়া পটা দ বাং
মচা মেনাঃ তায়া ডাটা দ বাং—"[৫৯]

অর্থাৎ,

পেট আছে আঁতি-দড়া নাই (* নাড়ি ভুঁড়ি)*
মুখ আছে দাঁত-ঝড়া নাই—"
উত্তর: কলসি

ধাঁধাটি গোবরা সাঁওতাল জিজ্ঞেস করে এবং ভুবনলোধা ও ফুলটুসির মেয়ে নুকু এর উত্তর দেয়।

নামাল খাটতে গিয়ে লোধারা বেশ কিছু নতুন ধাঁধা শুনতে পায়। যেমন—

১) "বক বসিচি ধাড়িকে ধাড়ি ইন্দ্র করে তপ।
এই ঢকটি যে ভাঙি দব তাকু দেমি সনার শঁক।।"[৬০]
উত্তর: ধবলা দাঁতের ঝোড়া

২) "অতটুকু জলে মাছ কব্ কব্ করে।
সাতশ জালির ব্যাটা নাহি ধরতে পারে।"[৬১]
উত্তর: ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি

৩) "আঁক পুকুরে পাঁক নাই, জল ছিল্ ছিল্, মাছ নাই—"[৬২]
উত্তর: ডাব

৪) "হেঁ হেঁ নাথ ভুইরু বাহারলা আঢ়িই হাত।
পুঅর মাথায় চুল পাকি গলা বাপের বয়স কত হেলা?"[৬৩]
উত্তর: ভুট্টাগাছ

৫) তলে মাটি উপরে মাটি।
মাঝু বুসচে পাথর রাটি।।"[৬৪]
উত্তর: ওল (আলুতুঙ্গা)

সংগীত

লোকসমাজ বা আদিবাসী সমাজে প্রচলিত গানের পর্যালোচনা করার পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের যে সামগ্রিক রূপটি রয়েছে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে ভারতীয় সঙ্গীতের একটা পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—

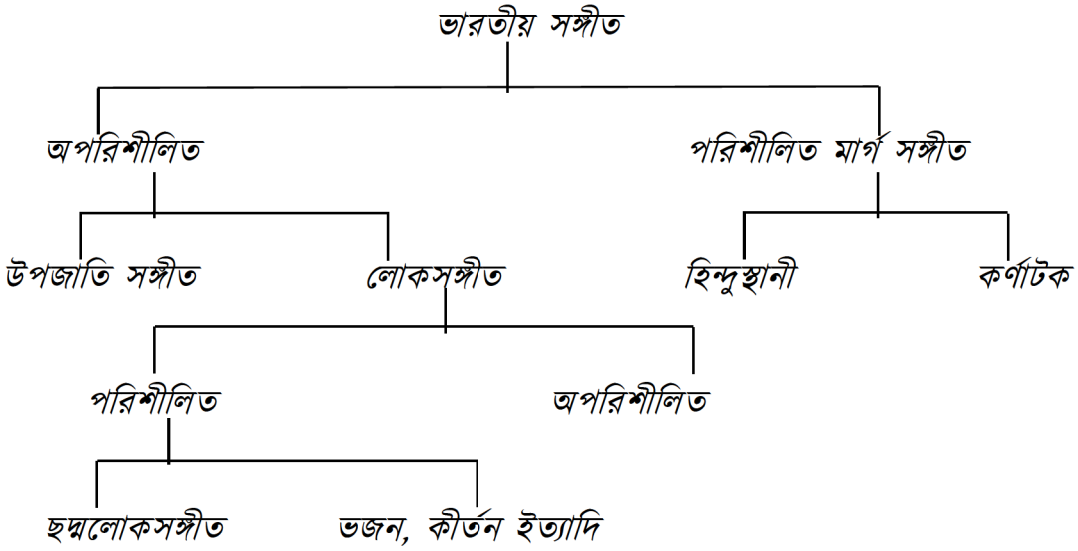

চিত্র ১: ভারতীয় সঙ্গীত

সভ্যতার প্রথমদিকে উদ্ভব ঘটেছিল অপরিশীলিত ভারতীয় সঙ্গীতের। আদিম সঙ্গীতকে বলা হল লোকসঙ্গীতের জননী। প্রাচীনকালে সঙ্গীত ছিল মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সঙ্গীত ছিল তাদের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার। তাই এই সঙ্গীতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় আদিম মানুষের সমস্ত চিন্তা ও অনুভূতি। শিকারজীবী আদিম সমাজে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় নৃত্যভঙ্গিমায় অঙ্গসঞ্চালনের মধ্যে দিয়ে। এই আদিম সঙ্গীতই ক্রমে রূপ নিয়েছে লোকসঙ্গীতের। লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সাধন ভট্টাচার্য বলেছেন—

> *"লোকসঙ্গীত হল লোকসমাজ কর্তৃক মুখে মুখে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৃষ্টি ও সুর সহযোগে গীত; সাধারণত কর্ম, প্রেম ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত একজাতীয় গান যা স্মৃতির মাধ্যমে বাহিত বলিষ্ঠ জীবনচেতনা ও সুরের ও গায়নরীতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে জীবনমুখী।"*[৬৫]

সুরের কাঠামের ভিত্তিতে সঙ্গীতকে সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

১) পাহাড়ের গান

২) নদীর গান

৩) সমভূমির গান

কিন্তু বিষয়বস্তুর বিভাজন করলে গানের শ্রেণিগুলি বিভক্ত হয় এভাবে—

১) উৎসব ও অনুষ্ঠানের গান

২) কর্ম ও শ্রমকেন্দ্রিক গান

৩) প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের গান

৪) আঞ্চলিক গান

৫) ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশক গান

'শবরচরিত' উপন্যাসে উল্লিখিত গানগুলির দিকে তাকালে সহজেই অনুমান করা যায় এগুলির বেশিরভাগই উৎসব ও অনুষ্ঠানভিত্তিক গান। শবরদের জীবনে 'চাঙুগানে'র ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। 'চাঙুগান' হল 'চাঙু' নামক বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে নৃত্য করার সময় গাওয়া গান। এই গান যেমন উৎসব অনুষ্ঠানের আসর মাতিয়ে তোলে তেমনি কাজকর্মের ফাঁকে বিরতির উদ্দেশ্যে বা কাজের এক ঘেয়ামি কাটিয়ে তুলতেও গাওয়া হয়—

"মনে করু মনস্তাপ
আর দিমু নাকি জড়েই ঝাঁপ,
ঝাঁপ দিড়ে ডুবিঞে মরিমু গ'
কেম্‌নে লদী পাইরাঁই যাব।"[৬৬]

আলোচ্য উপন্যাসে কয়েকটি 'করম' গীতিরও উল্লেখ রয়েছে। প্রকৃতি পূজার একটি অন্যতম রূপ হল করম পূজা। আদিবাসী লোককথা ও সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী 'করম' গাছ সৃষ্টির আদিমতম বৃক্ষ। পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর,

বিহারের রাঁচি, হাজারীবাগ, পালামৌ, সিংভূম, ধানবাদ, সাঁওতাল পরগণা, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড়, মধ্যপ্রদেশের রায়গড়, প্রভৃতি এলাকায় করম উৎসব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়। এই পূজায় করম গাছের ডালকে করম ঠাকুর, করম রাজা বা করম গোসাঁই বলে পূজা করা হয়। *"অঘ্রাণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অথবা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য থাকলে শবরেরা করম পূজা করেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই অংশ নিতে পারে। নিজেদের ভাষায় গান আছে। করম এদের কুলদেবতা।"*[৬৭] উপন্যাসে উল্লিখিত করম পূজার গানগুলি হলো—

"হাতি চড়ি আয়ো ত ইন্দর রাজা
ঘোড়া চড়ি আয়ো ত করম রাজা।"[৬৮]

কখনো কখনো করম পূজায় ঝুমুর গানও গাওয়া হয় যার উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে। করম একাদশীর দিনে বঙ্কা মাহাতোর বাড়িতে গাওয়া একটি গান—

"তুঁই হামার সরু সিঁথা তুঁই গলার মালাগাঁথা
তুঁহেই সাধের আয়না কাঁকই লো, হে ওহে ধনি।
তুঁই ধনি জামাজুতা তুঁহেই পাগড়ি টেরা।
তুঁহেই কানের ফুল লো সজনি ধনি।
তুঁই ভালবাসাবাসি তুঁই মুহের মুচকি হাঁসি।
তুঁহেই চইখের চঞ্চল চাহনি লো, হে ওহে ধনি।"[৬৯]

এটি একটি ঝুমুর গান। রাইবু গুড়গুড়িয়ার গালায় এই গানটি শুনে মুচকি মুচকি হেসে মনে মনে বলে, *"শালা গুড়গুড়ে সম্বারির তরে পাগ্‌গল হঁই গেছে হে, ওহে। বঙ্কা মাহাতোর ঘরে করম একাদশীতে গাহা সেই ঝুমুর শালা অবিকল তুলে ফেলেছে!"*[৭০]

'বিবাহ' একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই রীতি বা প্রথা মানবজীবনের একটি বিশেষ পর্যায়কে আনুষ্ঠানিক রূপদান করে। দু'টি মানব-মানবীর আনুষ্ঠানিক এই বন্ধন আনন্দানুষ্ঠান হিসেবেই চিহ্নিত। সেহেতু বিবাহ উপলক্ষে গান-গাইবার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। শবর সমাজেও বিবাহ উপলক্ষে গানের প্রচলন লক্ষণীয়। বিবাহের গান একান্তভাবে স্ত্রী আচারের সঙ্গে জড়িত। বিবাহের

বিভিন্ন অনুষঙ্গ, যেমন- গায়ে হলুদ, জল ভরতে যাওয়া, স্নান করানো, পান খিল করা, শাঁখা সিঁদুর পরানো ইত্যাদিতে স্ত্রীদের মুখে গান শোনা যায়। 'শবরচরিত' উপন্যাসে লোধারা তসর চাষের জন্য বন থেকে তসর বীজ, তসর-ঠয়া খুঁজে ঘরে ফিরলে শিশুবালা সমেত অন্যান্য স্ত্রীরা তসর বীজ আহরণকারীদের বরণ করে ঘরে তোলে। যা জটালোধার বউবুড়ির কাছে বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো মনে হয়ে। তাই সে উৎফুল্লিত চিত্তে সোমবারিকে বলে, *"আয় ছুঁড়ি তকে হলদি মাখায়।"*[৭১] এবং সেই সঙ্গে একটি বিয়ের গানও গায়—

"কে হলদি মাখায় মাগো,
কে হলদি মাখায়।
যে বঠে কইন্যার ভাজ গো সে হলদি মাখায়,
মাগো, সে হলদি মাখায় ।"[৭২]

এছাড়া, বিবাহকেন্দ্রিক আর একটি গান রয়েছে এই উপন্যাসে।

"কুঁখির ভিখারি দুয়াড়ে ডাঁড়ালে
ভিখ দিড়ে ভিখ নাই ক
কড়র ঝিক খজয়
কড়র ঝিক দিম নাই কড় হেবেক শুখা
গাছের বাইগন দিয়েঁ দিড়ে গাছ হেবেক শুখা।।"[৭৩]

গানটিতে বলা হয়েছে, বর দ্বারে ভিখারী সেজে ভিক্ষে করতে এসেছে । কিন্তু ভিক্ষা দিলে নিচ্ছে না কিছুই। সে ভিক্ষে হিসেবে চাইছে বাড়ির কোলের মেয়েকে। কিন্তু কোলের মেয়েকে দিলে কোল শূন্য হয়ে যাবে। তাই কোলের মেয়েকে কনের বাড়ির কেউই দিতে চাইছে না। এখানে কনেকে বেগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বেগুন গাছ থেকে বেগুন তুলে নিলে গাছ যেমন খালি হয়ে যায়। বিয়ে দিয়ে কনেকে বরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেও ঘরও তেমনই খালি হয়ে যায়।

যৌথ কর্মের আন্তরিক প্রেরণা এবং হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তির দ্বারা কর্মসংগীতের সৃষ্টি হয়। কর্মসংগীত দু'টি লক্ষ্য সাধন করে। এক, যৌথভাবে কাজ

সম্পন্ন করার তাগিদ এবং দুই, কাজের একঘেয়ামি থেকে মুক্ত করে কাজের গতি বজায় রাখা। চাষবাস, নৌকা চালনা, এমনকি ছাদ-পিটাই ইত্যাদি কাজের সূত্রে কর্মসংগীত সৃষ্টি হয় এবং প্রচলন পায়। আলোচ্য উপন্যাসে শবরদের মুখে বেশকিছু কর্মসংগীত শোনা যায়। ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে চলতে চলতে গুরভা বউয়ের মনে পড়ে।

"ধান ধান ধানরাজ
কিয় ধান বটে গো—
বাসমতী কমলিনী কয়াধান বটে গো
বাসমতী কমলিনী কয়াধান বটে।"[৭৪]

ধান কাটা এবং ধানের বোঝা বয়ে ঘরে নিয়ে যাওয়ার এই গান শবর সমাজের নিজস্ব নয়। কারণ, পূর্বে চাষাবাদের সঙ্গে লোধাশবরেরা যুক্ত ছিল না। বনের ফল-মূল এর দ্বারাই এরা এদের প্রত্যহের আহার যোগাড় করে নেয়। বন সম্পদ সংগ্রহই তাদের জীবিকার প্রধান এবং একমাত্র আধার। চাষাবাদের মতো জমি না থাকায় এরা পুরোপুরিভাবে জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। এমনকি এরা অন্যান্য জনজাতির জমিতেও কামিন হিসাবে কাজ করতে চায় না। বরং দেখা যায়, এদের সমাজে কামিন খাটাতে অর্থাৎ দিন মজুর খাটাতে বারণ করার সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। তাই উপন্যাসে, প্রথমবার বসন্ত কামিল্লা দিনমজুরের খোঁজে লোধা-শবরদের গ্রামে এলে রাইবু ব্যঙ্গ করে একটি গান শোনায়।

"সকাড়ে উঠি-পুটি কামিন ডাকিৎ গেনু
কামিন ডাকা বড় খদামদি
পাছে কামিন না আসৎ যদি—"[৭৫]

যেহেতু, এই গানটি দিনমজুর খাটতে যেতে না চাওয়ার গান নয়, দিনমজুর খাটানো বারণের গান তাই বসন্ত কামিল্লা টিটকারি মেরে বলে, *"অ-রে শালা! কামিন খাটতে যাওয়া তোদের জাতে নেই, আবার কামিন খাটাবার জমিদারী নিয়ে বেশ তো গীত ফেঁদেছিস!"*[৭৬] কিন্তু তবুও রাইবু বলে ওঠে—*"ন্নাই, আমাদের জাইতে উসব নাই,*

কামিলা।"[৭৭] আর এর কারণ জানতে চাইলে রাইবু সোজাভাবেই জানায়, *"ধর্, তোর জমিনে ধান কাটতে গেল আমার বহু। সারাদিন কোমর বেঁকা করে ধান কাটল। কাটাধান একদিন-দুদিন ত জমিতেই পড়ে থাকে, থাকল। রাইতের বেলা চোর এসে লিঐে গেল। কে লিল, কে লিল—ধর্, শালা লদ্ধা ব্যাটাকে, রাইবুকে। উহার বহু-ই ত আজ ধান কাটতে এসেছিল!"*[৭৮] বরাবরই এরূপ ঘটবে ভেবেই এরা অন্যের জমিতে দিনমজুর খাটতে যায় না। ফলে কর্মসংগীতের উদ্ভবের আশাও ছিল ক্ষীণ। কিন্তু পরবর্তীতে এরা জীবনসংকটে পড়ে জীবিকার সন্ধানে দূরদেশে দিনমুজুর খাটতে গেলে দু'একটি কর্মসংগীত শোনে এবং আস্তে আস্তে নিজেরাও কিছু কর্মসংগীত রচনা করতে উদ্যত হয়। কর্মভিত্তিক যে গানগুলি শবরলোধাদের কণ্ঠে শোনা যায় সেগুলি হল—

"ধানবিলে চল লো ধনি দেখাঁই দিব কেরদানি—
আনুছি ধান-অ নিয়ে কিনি—"[৭৯]

এই ধান কাটা সম্বন্ধীয় গানটি উপন্যাসের চরিত্র 'লাইবুকা'র নিজস্ব রচনা। লাইবুকার রচিত আরেকটি গান হল—

"সকালেই শুই উঠি দে গো বিটি নাম্‌হালের টাকা,
নাম্‌হালের টাকা তো আর মুফতে হয় না
চামরাঙা দেহে হায় কালি পড়িল।।"[৮০]

এটি নামাল খাটার পরিশ্রম নিয়ে রচিত গান।

লোধা-শবর সমাজের কিছু কিছু গানে প্রতিবাদের সুরও উঠে আসতে দেখা গেছে। লোধা সমাজে লেখা-পড়া জানা মেয়ে লক্ষীরানী মল্লিক ওরফে নুকুর একটি প্রতিবাদী কবিতা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই গান হয়ে ওঠে।

" দরখুলির জঙলে কপ্‌তি-গুঁড়ুর পাখ ডাকে
চল্ রাণী চল্ মুনু পা ফেলাঐে একসঙে,
কেদ্-ভুড়রু পেকে আছে কুঁদরী-কাঁকড়ো ধরে আছে
তুল্ রাণী তুল্ মুনু যত ইচ্ছা হাত ভরে।

ভখ্‌লাতে আলু-তুঙা যদি ধরে নরসিঙা
বল্‌ রাণী বল্‌ মুনু একসঙে চেঁচাঞে—
বনে জনম বনে মরণ বন লোধাদের হকের ধন
কহে দে রাণী কহে দে মুনু, বন আমাদের মা বঠে।।"[৮১]

লক্ষীরানী মল্লিকের লেখা 'বন-মা' নামক এই কবিতাটি পরবর্তীতে শতুরার কণ্ঠে গান হিসাবে ফুটে ওঠে। শতুরা কবিতাটিতে সুর দিয়ে গানটি শুরু করেছে এভাবে—

"অহীরা—
দরখুলির জঙলে কপ্‌তি-গুঁড়ুর পাখ ডাকে
চল্‌ রাণী চল্‌ মুনু পা ফেলাঞে একসঙে....."[৮২]

আদিবাসী সমাজের এক বড় সমস্যা হল মদ-হাঁড়িয়ার নেশা। নেশার জালে জড়িয়ে তারা নিজেদের সর্বস্ব শেষ করে দেয়। নতুন প্রজন্মের নীলেশ্বর ও তাঁর বন্ধুরা আদিবাসী সমাজকে এই অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে নেশার বিরুদ্ধে একটি গান বাঁধে—

"মদ হাঁয়ড়া শতরু হামাদের
আর নাই যাব শুঁড়ির ঘরে।
একেই গলায় সবাই বলব—
মদ-হাঁয়ড়া আর খাব নাই।।"[৮৩]

মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে দিক বন্দনার সাথে সাথে বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা লক্ষণীয়। তবে মধ্যযুগের পরবর্তীকালের সমাজেও এই বন্দনার পরম্পরা অক্ষুন্ন ছিল। লোধা-শবরদের গানেও এই বন্দনার পরম্পরা লক্ষ করা যায়। কখনো দাঁড়িয়ে আবার কখনো বসে তারা এই বন্দনা করে। নাচ-গানের শুরুতে তারা গাঁয়ের 'গরাম'কে বন্দনা করে নেয়।

"এহি বাটে আসুছন্তি গাঁয়ের গরাম।"[৮৪]

আর একস্থানে বন্দনা শুরু হয়েছে এভাবে—

"পরথমে বন্দনা করি আহে—
আহে গুরু বন্দিতে বন্দিনি।
আহে গুরু বন্দিতে বন্দিনি।।"[৮৫]

এছাড়াও উপন্যাসে লোধা-শবরদের সমাজে প্রচলিত আরো কিছু গান শোনা যায়। যে গানগুলির মধ্যে কিছু প্রেম সঙ্গীত রয়েছে। প্রেমের গভীর আবেদন থেকেই প্রেম সঙ্গীতের সৃষ্টি। যেগুলিকে শবরেরা বলে 'রঙের গীত'। উপন্যাসে লাইবুকার কণ্ঠে দু'টি প্রেমসঙ্গীত শোনা যায়—

ক) *"বসে থাকি পাশাপাশি*
অকারণে গেল রাইত হে—
মন দিয়ে মন পাওয়া গেল না।
তুমি থাকো সাথে
ঝিকিমিক রাতে—
মন দিয়ে মন পাওয়া গেল না।।"[৮৬]

খ) *কুল্হি দিগের পিঁড়ায় বসে দুটি তারা গুনবি।*
আসছে লো তোর ভালোবাসা মিঠাই খালা ধরবি।।
যে ছোঁড়ির মরদ নাই তার মন কেমন করে যে।
উলটি-পালটি ছোঁড়ি করটে ঘুমায় রে।।"[৮৭]

সেই সঙ্গে আমরা ফুলটুসির গলায় রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক একটি প্রেম সঙ্গীতও শুনি—

"প্রেমের আগুন জ্বেলে দিয়ে
পারলে নাই আর নিঝাতে
শ্যাম পারলে নাই আর নিঝাতে
ফুলের মালা হৈল বাসি
পারলে নাই গো পরাতে।"[৮৮]

লোককথা

গল্প বলা এবং গল্প শোনার প্রবণতা মানুষের মধ্যে অতীত থেকে আজ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। গ্রামাঞ্চল, নগর-বন্দর সবস্থানের লোকই গল্প শুনে এবং গল্প শুনিয়ে অভ্যস্ত। লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মধ্যে লোককথা অন্যতম। লোকসমাজ থেকে উঠে আসা নানান কথা-কাহিনি বিভিন্ন সম্ভব-অসম্ভব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এটি মূলত শ্রুতিবাহী বা Oral tradition –এর অংশ। আলোচ্য উপন্যাসে লোধা-শবরদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানান কথা ও কাহিনির উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসের প্রথমদিকে যে কাহিনিটি শুনতে পাওয়া যায় সেটি লোধা-শবরদের জাতিসত্তার সামাজিক অবস্থানকে নির্দেশ করে। এই লোককথায় শবরেরা নিজেদের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে, বিশেষত ব্রাহ্মণ জাতি থেকে উঁচু বলে প্রতিষ্ঠা করে। আদি কথাটি এইরূপ—কোনো একসময় একবার স্বয়ং ভগবান গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। সেই পা-দুটি পদ্মফুলের মতো রাঙা এবং সুন্দর। জরাশবর সেই পা-দেখে ভাবে সেটি মিরগির কান এবং দেরি না করে তীর ছুঁড়ে দেয়। আর সেই তীরেই ভগবানের মৃত্যু হয়। কিন্তু মরবার আগে ভগবান জরাশবরকে বলে যায়—*"জরা রে তুঁই বেড়ে পুণ্যিমান, এবার থেক্যে তোর জাত হবে বেরাম্ভণের থিক্যেও বড়।"*[৮৯] আর শবরদের বিশ্বাস, সেই জরাশবরদের বংশধরই হচ্ছে আজকের শবরেরা। তাই বর্তমানে তাদের সামাজিক বা আর্থিক পরিস্থিতিই যেরকমই থাকুক না কেন, তারা জাতি বিচারে নিজেদের সবার থেকে উঁচু স্থানে বসিয়েছে।

লোধাদের দারিদ্র্যে পরিপূর্ণ জীবন নিয়েও প্রচলিত রয়েছে একটা লোককথা। জঙ্গলমহলে বসবাসকারী সাঁওতাল, তাঁতি, মাহাতো ভূমিজ সকলেরই চাষবাসের জন্যে অল্প বিস্তর জমিজমা আছে কিন্তু লোধাশবরদের চাষবাসের মত জমিজমা তো দূরস্থ বাড়ির উঠোনে বা আনাচ-কানাচ শাক-সবজী চাষের মতোও জমি নেই। এর কারণ হিসাবে তাদের সমাজে প্রচলিত কাহিনিটি হল—বহু বহু যুগ পূর্বে লোধা-শবরদের চাষাবাদের কাজ শেখানোর জন্য শিব গরু এবং লাঙ্গল দিয়ে বলেছিল, জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরি করতে। শবরেরা শিবের সেই আদেশে

জঙ্গল কাটতে শুরু করে। জঙ্গল কাটতে কাটতে তাদের খিদা পেলে কাছাকাছি কিছু না পেয়ে তারা শিবের দেওয়া সেই হালের বলদটি কেটে খেয়ে নেয়। শবরদের এই কাণ্ডে শিব অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের অভিশাপ দিয়ে বলে- বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মরতে হবে শবরদের। এই কারণেই শবরদের কপালে চাষাবাদ নেই বলে তাদের বিশ্বাস। এরই সাথে আরেকটি বিশ্বাস জড়িয়ে আছে, সেগুনের পাতায় তাদের পূর্বপুরুষেরা গরুর মাংস খেয়েছিল। তাই সেগুন গাছের পাতা ঘষলে লাল রঙ দেখা যায়, যা গরুটির রক্ত। আসলে লোধাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় নিজেদের সান্ত্বনা দিতে এই কাহিনির সৃষ্টি।

উপন্যাসে উল্লিখিত আরকেটি লোককথাও লোধা-শবরদের মর্যাদা জ্ঞাপক। এই লোককথাটিই পরবর্তীতে পালার আকার ধারণ করে নাম নেয় 'ললিতা পালা' বা 'নলিতা পালা'। কারো কারো বিশ্বাস লোধারা 'বসুশ্রবা'র বংশধর। 'বসুশ্রবা' বসুশবর-এরই ভালো নাম। লোককথাটি বসুশ্রবা বা বসুশবরের পালিতা কন্যা ললিতার কাহিনি কথা। এই কাহিনিতে বলা হয়েছে, বসুশবরের আরাধ্য দেবতা ছিল নীলমাধব। সেই নীলমাধবকে চুরি করে নিয়ে যেতে ইন্দ্রদুম্ন নামক রাজা বিদ্যা নামক এক ব্রাহ্মণ যুবককে পাঠিয়েছিল বসুশ্রবার কাছে। ব্রাহ্মণ যুবক বিদ্যা বৃদ্ধের বেশধারণ করে বসুশবরের ঘরে আশ্রয় নেয় এবং ললিতাকে বিয়ে করে। ব্রাহ্মণ বিদ্যা ললিতাকে ছেড়ে যাবার ভয় দেখিয়ে একদিন বসুশবরের আরাধ্য দেবতা নীলমাধবের গুপ্ত থানে যেতে চায়। বসুশবর সহজে নিয়ে যেতে রাজি হয় না। কিন্তু বিদ্যা তার মেয়েকে ছেড়ে চলে গেলে অকল্যাণ হবে এই ভেবে শেষে একদিন রাজি হয়। তবে বসুশবর এতে একটি শর্ত রাখে। এই শর্তটি হল, বিদ্যাকে চোখ বেঁধে নীলমাধব থানে যেতে হবে। এই শুনে ললিতা তার স্বামীর হাতে মাঘি তিল দিয়ে বলে থানে যাবার পথে সে যেন এই তিলগুলি ছিটিয়ে যায়। পঞ্চম দিনে যখন তিলগুলি থেকে চারা বের হবে তখন সে সহজেই থানের পথ চিনে নিতে পারবে। ফলে দেখা যায় বসুশবর বিদ্যাকে চোখ বেঁধে নীলমাধবের থানে নিয়ে গেলেও সে মাঘি তিলের চারাগাছ দেখে নীলমাধব বিগ্রহ চুরি করতে সক্ষম হয়। এবং ললিতাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। বলা হয়, নীলমাধব বিগ্রহটি পরে

ফিরে এসেছিল। কিন্তু বসুশবর তার মেয়ের জন্যে কাতর হয়ে দিন রাত বলত "লে রে কালিয়াদ্যাবতা হামার পূজা লে। দে রে কালিয়াদ্যাবতা হামার ললিতাকে দে।"[৯০]

মান্যতা আছে, লোধা-শবরদের মেয়ে জামাই *"ললিতা-বিদ্যার ছেলে অঙ্গপতির ছেলের ছেলে তস্য ছেলের ছেলের ছেলের ছেলের,...তার ছেলের ছেলেরাই এখনো পুরীর রথ টানে তাদের হাতের ছোঁয়া না পেলে রথ চলে না।"*[৯১] শবর কন্যা ললিতাকে ব্রাহ্মণ বিয়ে করেছিল বলে শবরেরা মনে করে ব্রাহ্মণ তাদের জামাই অর্থাৎ সম্বন্ধে ছোটো। তাই তারা ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে না। আর যেহেতু ললিতা-বিদ্যার উত্তরপুরুষদের হাতের ছোঁয়া না পেলে নীলমাধব জগন্নাথের রথ চলে না তাই তারা সামাজিক বিন্যাসের উঁচু স্তরে নিজেদের স্থাপন করে।

মানব সমাজের একটি প্রচলিত অভিমত হচ্ছে, মানুষের বৈবাহিক জীবনের পূর্ণতা ঘটে সন্তান লাভের মধ্যদিয়ে। দীর্ঘ বৎসর সন্তানহীন দাম্পত্যজীবনে সন্তান লাভের ব্যাপারটি লোকসমাজে অলৌকিক কাহিনির দ্বারা প্রচারিত হয়। লোধা-শবর সমাজেও সন্তান প্রাপ্তির অলৌকিক কাহিনির প্রচলন রয়েছে। এরকমই একটি কাহিনি শোনা যায় শবর চরিত্র চাঁদবদনীর মুখে। গল্পটিতে রয়েছে সন্তানহীন এক রাজা ও সাত রানির সন্তান প্রাপ্তির কাহিনি। সন্তানহীন সেই রাজা ও তার সাত রানির মনে কোনো সুখ বা শান্তি কিছুই ছিল না। রাজা সারাদিন শুধু রোদন করত। শুধু তাই নয় রাজ্যের সকল মানুষ ও পশু রাজার দুঃখে দিবা-নিশি কান্না করত। হঠাৎ একদিন রাজার কাছে এক সন্ন্যাসী এসে বলে, রাজার দুঃখের কারণ জিজ্ঞেস করে। রাজার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সন্ন্যাসী রাজাকে বলে, সকালে ঘুম থিকে উঠে নাক বরাবর ঈশানে গিয়ে এক গাছের এক বোঁটায় ধরা সাত-সাতটা আম এনে সাত রানিকে খাওয়ালেই রানিদের গর্ভে সন্তান আসবে। রাজা আম নিয়ে আসলে সাত রানির মধ্যে আম নিয়ে ঝগড়া বেঁধে যায়। ফলে ছোট রানির ভাগ্যে আম জোটে না, সে পায় আমের আঁটি। এই আঁটি সে চুষে চুষে খায়। কিন্তু আশ্চর্য জনকভাবে দেখা যায় ছোট রানির কোল আলো করে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্ম নেয়। বাকি ছয় রানির কারোই সন্তান হয় না। তাই ছয় রানি

ষড়যন্ত্র করে ছোট রানির শিশু দু'টিকে কুমোরদের মাটিখানায় দিয়ে আসে এবং ছোটরানির বিছানায় শুইয়ে রাখে দু'টি আস্ত 'শিল-নোড়া'। রাজা শিকার থেকে রাজবাড়িতে ফিরে এলে বড় ছয় রানি রাজাকে ডাকে এনে শিল-নোড়া দেখিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে, এই দেখ রাজা তোমার ছেলে-মেয়ের মুখ দেখ। রাজা ছোটরানির বিছানায় আস্ত দু'টো পাথর দেখে চটে গিয়ে ছোটরানিকে তাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে কুমোর মাটিখানায় ফেলে রাখা রাজার ছেলে ও মেয়েকে এক নিঃসন্তান কুমোর দম্পতি কুঁড়িয়ে পায়। এবং আদর যত্নে বড় করতে থাকে। একটু বড়ো হলে ছেলে মেয়েরা হাতি ঘোড়া ইত্যাদি রাজকীয় বায়না করতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাদের কুমোর পিতা-মাতার জ্যান্ত হাতি ঘোড়া কিনে দেওয়ার সামর্থ্য না থাকায় মাটি দিয়ে হাতি ঘোড়া বানিয়ে দেয়। শিশু দুটি সেই মাটির হাতি-ঘোড়াকেই দানা পানি খাওয়ায়, সেগুলিতে চরে শিকারে যায়।

প্রকৃতির চিরন্তন ক্রিয়াকলাপকে নিয়েও লোধা-শবরদের সমাজে প্রচলিত কিছু মৌখিক কাহিনি রয়েছে। এরকমই একটি কাহিনি হচ্ছে সূর্য ও চাঁদের উদয়-অস্তকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কাহিনি। চাঁদবদনী এই কাহিনিটি শুনিয়েছে লোধাপাড়ার কচি-কাঁচাদের। প্রচলিত কাহিনি অনুসারে চাঁদ ও সূর্য দুই বোন। কেউ কেউ আবার এদের সৎবোন বলেও পরিচয় দিয়ে থাকে। এই দুই বোন অর্থাৎ চাঁদ ও সূর্যের অনেক অনেক ছানা পোনা হয়। এত বেশি ছানাপোনা হয় যে আকাশে আর জায়গাই থাকে না। তবুও ছোট বোন চাঁদের সাধ জাগে সে আরো সন্তান জন্ম দেবে। কিন্তু একটিই আকাশ থাকায় চাঁদ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং ফন্দি এঁটে সূর্যের কাছে গিয়ে বলে, তোর-আমার এত বেশি ছানাপোনা! তাদের খবারদাবার ও পালন-পোষন করতে ভীষণ অসুবিধে হবে। তাই ছানাদের গিলে গিলে শেষ করে দিতে পারলে আর চিন্তা থাকবে না। স্বস্তিতে দিন কাটাতে পারব। চাঁদ সূর্যের কাছে একথা বলে নিজের বাড়িতে নিজের ছানা পোনাদের ঝুড়িতে লুকিয়ে রেখে দেয়। সূর্য দেখে আকাশে শুধু তারই ছানা পোনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তখন তার বোন চাঁদ এসে বলে, এই দেখ দিদি এখন আমার ঝাড়া হাত-পা। এই শুনে সূর্যও এক-এক করে তাঁর সমস্ত ছানা পোনাদের সত্যি সত্যি খেয়ে নেয়। এবং চাঁদের

কাছে গিয়ে বলে আমারও এখন ঝাড়া হাত পা। এরপর সূর্যের চোখের সামনেই ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে আসে চাঁদের অগণিত ছানা পোনা এবং আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। বলা হয়, সেই থেকে সূর্যের আর চাঁদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি নেই। একজন উদয় হলে আর একজন অস্ত যায়। সূর্য আকাশে একাকী ওঠে আর চাঁদ ওঠে তার অগণিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে।

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সংস্কার

সাধারণত যেকোনো সমাজে জন্মের পূর্ব থেকেই গর্ভজাত সন্তানের মঙ্গল কামনায় নানা ধরনের আচার-আচরণ পালিত হয়। এমনকি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও নবজাতক শিশুর মঙ্গলার্থে নানা ধরনের লোকাচারের আয়োজন করা হয়। লোধা-শবরদের সমাজে প্রচলিত জন্মসংক্রান্ত কোনো লোকাচারের কথা ঔপন্যাসিক তুলে না ধরলেও, নবজাতক শিশুকে কেন্দ্র করে লোধা-শবরদের যে ধারণা রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন—

> *"কালো, ঘোর কালো, তা সে যতই কালো হবে, লোধাদের তত ভালো। কালোর মধ্যে সাদা জন্মালে সে-এক ঝঞ্ঝাট, সে এক অবৈধ ব্যাপার 'বেধুয়া ছানা'। জরিমানা দিতে হবে 'গ্রাম-ফাণ্ডে'। ছাড়ান, নিমছা যা হোক করে খাওয়াতে হবে গ্রামের লোকেদের।"*[৯২]

তাই দেখা যায়, শত্রুঘ্ন লোধার স্ত্রী ফর্সা ছেলে ফুলেশ্বরকে জন্ম দিলে গ্রামে কানাকানি হয়। এবং শেষে ফর্সা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে তাদের জরিমানা দিতে হয়।

বিবাহের যে আচার-অনুষ্ঠান, লৌকিকতা লোধা-শবরদের সমাজে প্রচলিত তার বেশ কিছু অংশ উঠে এসেছে 'শবরচরিত' উপন্যাসে। শবরদের বিবাহ মূলত লৌকিক আচার-সংস্কারে লালিত। শাস্ত্রীয় কোনো রীতি এতে নেই। বিবাহ হচ্ছে একটি সামাজিক প্রথা যার মূল উদ্দেশ্যই বংশরক্ষার ব্যবস্থাপনা। পরবর্তী প্রজন্মকে পৃথিবীর আলোতে নিয়ে এসে নিজের অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী করা। শবর সমাজে বংশরক্ষার উদ্দেশ্যেই বিবাহ সম্পাদন করা হয়। তবে যে কেবল পুত্র সন্তান

লাভের আশাতেই এরা বিবাহ সম্পন্ন করে তা নয়। এরা ছেলে কিংবা মেয়ে দু'টোর যেকোনো একটি হলেই সন্তুষ্ট। কারণ, এরা বংশ বলতে কেবল ছেলে বা ছেলের ঘরে ছেলের জন্মে বংশের শৃঙ্খল বৃদ্ধকেই বংশ রক্ষা বলে বিবেচনা করে না। এরা ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে নতুন প্রজন্মকে পৃথিবীতে নিয়ে এসে লতার মতো বংশ শৃঙ্খলকে বাড়িয়ে নিয়ে চলতে বিশ্বাসী। তাই রাইবু এবং শিশুবালার সন্তান না জন্মালে রাইবু তার নিরুদ্দেশ হওয়া বোনের কথা ভেবে বলে, *"সোমবারিটা ছিল। ছেলের ঘরে না হোক, থাকলে মেয়ের ঘরেও তো মেয়ে কিংবা ছেলে হতে পারত।... একটা বংশের লতা চলত, চলতই, থামত না।"*[৯৩] লোধাদের সমাজে দ্বিতীয় বিবাহের প্রচলন রয়েছে। প্রথম বিবাহকে এরা বলে 'বিহা' এবং দ্বিতীয় বিয়েকে বলে 'সাঙা-বিহা'। রাইবু ও শিশুবালা নিঃসন্তান বলে শিশুবালা রাইবুকে বহুবার দ্বিতীয় বিবাহ অর্থাৎ 'সাঙা-বিহা' করতে অনুরোধ করে। কিন্তু রাইবু সন্তান লাভের আশায় কখনো শিশুবালার এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

বিবাহ-পণ গ্রহণ করার প্রচলন অনেক সমাজে প্রচলিত রয়েছে। সে পণ কন্যাপণই হোক আর বরপণই হোক। শবর জনজাতির বিবাহের ক্ষেত্রে তা একটু আলাদা, এখানে বর কন্যার কাছে সরাসরি পণ চায়। এই পণ নগদ টাকা-পয়সা বা জিনিস পত্রের পণ নয়; এই পণ দায়িত্ব গ্রহণের পণ। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> *"লোধা 'জাইতের' বিয়েতে আছে, বিয়ের পরে বর ঘরের টুইয়ে কী গাছের ডালে উঠে পড়ে, কিছুতেই নামে না। বরঞ্চ ভয় দেখিয়ে বলে, 'মুই পড্ডি মরি যামু!' কনেকে দাঁড়াতে হয় নীচে, আর বলতে হয়, 'অলি আস-অ, তুঙ্গা তাড়ি খাওয়ামু।' তার মানে আলু খুঁড়ে বরের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিলে তবেই বর উপর থেকে নেমে আসবে।"*[৯৪]

গায়ে হলুদের লোকাচার মূলত একটি স্ত্রী আচার। বর-কনে উভয় পক্ষের বাড়িতে বর-কনেকে আলাদা-আলাদাভাবে বিবাহের পূর্বে গায়ে হলুদ মাখিয়ে মাঙ্গলিক স্নান করানোর স্ত্রী আচার প্রায় সব সমাজেই প্রচলিত রয়েছে। সেই সঙ্গে প্রচলন রয়েছে

গায়ে হলুদকে কেন্দ্র করে গান করার রীতি। শবর জনজাতির বিয়ে সম্পর্কে তেমন কোনো বর্ণনা উপন্যাসে না থাকলেও 'গায়ে হলুদ' কেন্দ্রিক গানের উল্লেখ রয়েছে।

"কে হলদি মাখায় মাগো,
কে হলদি মাখায়।
যে বেঠে কইন্যার ভাজ গো সে হলদি মায়।
মাগো, সে হলদি মাখায়।।"[৯৫]

মৃত্যুর পর আত্মার পরিণতি নিয়ে নানা সমাজে নানান জল্পনা কল্পনা করা হয়ে থাকে। তাই মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় নানাবিধ নিয়ম রীতি পালিত হয়। 'শবরচরিত' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে লোধা-শবরদের মৃত্যু সম্পর্কিত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি। লোধা-শবর সমাজে কারো মৃত্যু হলে দেহুরি (পুরোহিত) ডেকে আনা হয়। দেহুরি এসে মৃতের দোষ বিচার করে। এ দোষ হল মৃত্যুর দোষ। অর্থাৎ কিরকম অবস্থায় মৃত্যু ঘটেছে তার বিচার বিশ্লেষণ করে মৃত্যু দোষ বের করা। *"বুকের উপর হাত রেখে মরলে একরকম, পিঠের উপর হাত রেখে মরলে আরেকরকম, আবার চিৎ হয়ে শুয়ে মরলে আরেকরকম।"*[৯৬] এই বিচারে নানা দোষ হয়ে থাকে। যেমন, একপাদ, ত্রিপাদ, পুষ্করা ইত্যাদি। এর মধ্যে পুষ্করা দোষকে লোধা-শবর সমাজ অশুভ মনে করে। এদের বিশ্বাস *"পুষ্করা পড়লে আর দেখতে নাই। ঠিকঠাক ছাড়ান-কাটান না করলে—...মহা-বিপদ। এক এক করে ঘরের অবলা পশু পাখ-পাখালি এমন কী মানুষ পর্যন্ত নিধন হয়।"*[৯৭] আর বুকের উপর হাত রেখে মরলে অর্থাৎ ত্রিপাদ দোষ হলে আগে মৃতদেহ দাহ করে ছাড়ান-নিম্ছা করা হয়। 'দেহুরি'র দোষ বিচার করা হয়ে গেলে শবদেহটি ঘর থেকে বের করে দড়ির খাটিয়ায় শ্মশান নিয়ে যাওয়া হয়। শ্মশানের উদ্দেশ্যে শবদেহ নিয়ে বেরোলেই ঘরের ভিতর ও বাইরে গোবর জলের ছড়া ছিটানো হয়। যারা মরা নিয়ে শ্মশানে যায় তারা 'আঁটা' দড়িতে লোহার টুকরো বেঁধে নেয় এবং মরার মাথার শিয়রেও রাখা হয় লোহার টুকরো। এদের বিশ্বাস লোহা অশুভ শক্তির আক্রমণকে প্রতিহত করে। চারজন মৃতদেহটি কাঁধ দেয়। এবং পরিবারের একজন হাতে খড়ের ধূমন্ত 'ব্যধনা' নিয়ে শবদেহের পিছু পিছু যায়, যা দিয়ে মৃতের মুখে আগুন দেওয়া হয়।

শ্মশানে বনের কাঠ দিয়ে চিতা সাজিয়ে উত্তরদিকে মাথা করে শবদেহটিকে শোয়ানো হয়। এরপর মৃতের পরিবারের কেউ মুখাগ্নি দিয়ে জীবিত থাকাকালীন লোকটি যা যা খেতে ভালোবাসত তা চিতার আগুনে ফেলে দিয়ে, আর চিতার দিকে মুখ ফেরায় না। উপন্যাসে দেখা যায়, রাইবু তার পিতার সৎকারের সময় *"বাপের মুখে নুড়ো গুঁজে দিয়ে চুন-গুটুল দোক্তা-বনা খামআলুর পাতা চিতায় ফেলে দিয়ে সেই যে উল্টো দিকে নিজের মুখ করল রাইবু, আর সে মুখ এদিকে ঘুরালো না।"*[৯৮]

শ্মশান পর্যন্ত শবদেহটিকে যে দড়ির খাটিয়ায় করে নেওয়া হয় সে খাটিয়াটি থেকে শবদেহটি চিতায় তোলা হয়ে গেলে খাটিয়াটি মাটিতে উল্টে রাখা হয়। এদের বিশ্বাস শূন্য খাটিয়ায় অশরীরী আত্মা এসে আশ্রয় নিতে পারে। চিতা যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ খাটিয়াটি উল্টানোই থাকে। চিতা নিভে গেলে খাটিয়াটিকে কোনো একটি গাছে বেঁধে শ্মশান যাত্রীরা একে একে সেটিকে ডিঙিয়ে পার হয়। তাদের বিশ্বাস এতে মৃতের পথে বাঁধা পড়ে। ফলে সে আর লোকালয়ে ফিরে আসতে পারে না। শ্মশান থেকে ফেরার পথে এরা তিন ডুব দিয়ে স্নান করে এবং ভেজা কাপড়ে মৃতের বাড়ি পর্যন্ত আসে। অশ্বথ গাছ, বট গাছ, জাইড় গাছ খুঁজে প্রত্যেক শ্মশানযাত্রী শিকড়ওয়ালা বড় বড় গাছ জড়িয়ে ধরে। শ্মশান থেকে ফিরে মৃতের বাড়িতে গিয়ে শ্মশানযাত্রীরা তাদের 'আদা-কাপর' চিপে জল নিঙড়ে ফেলে। শ্মশান থেকে ফিরে আসা পুরুষেরা সোনা-রূপা নতুবা অভাবী সংসার হলে লোহা-পিতল দর্শন করে। সবশেষে নিমপাতা, ছোলা মুগ এবং গুড় খেয়ে মৃতদেহ সৎকার সম্পর্কিত কাজের সমাপ্তি ঘটায়।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

ইহজীবনের চাওয়া পাওয়া নিয়ে মানুষের মনে রয়েছে নানা বিশ্বাস ও সংস্কার। সে অনুযায়ী তাদের জীবনে নানা লৌকিক দেব-দেবীর সমাবেশ ঘটে। সেই দেব-দেবীর সঙ্গে মানুষের একটা চাওয়া পাওয়ার পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের আধারে মানুষ ইহজগতের চাহিদা মেটাবার জন্য নানা ধরনের প্রার্থনা করে এবং কখনো কখনো সেই প্রার্থনা পূরণের বদলে মানুষ দেব-

দেবীকে কিছু দিতে চায়। প্রার্থনা করার এই রীতিকেই বলা হয় মনত করা। মানত পূর্ব-শর্তযুক্ত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অন্যান্য সমাজের মতো লোধা-শবর সমাজেও মানত করার রীতি প্রচলিত। লোধাপাড়ায় একের পর এক বিপদ নেমে আসতে দেখে রাইবু বড়ামথানে ধার্য মানত পূরণ করতে পাঁঠা কিনতে বেরিয়ে পড়ে। *"বিপদ সমগ্র লোধাদের, বড়ো বিপদ, তাই একটা পাঁঠা খুঁজছে, চুরি করা নয় নাগদানগদি টাকায় কেনা। বড়ামথানে দেবে, মানত আছে।"*[৯৯] লোধা-শবরদের বিশ্বাস পুকুরের জলে পান-সুপারি দিয়ে মানত করলে পুকুর থেকে সোনার কলসি উঠে আসে। জ্বরের প্রকোপে পড়ে গুরভা পুকুর ধারে বসে ভাবে— *"একটা গুয়া একটা পান দিয়ে 'মানত' করলে পুকুরের জল থেকে থালা-বাসন-বারকোশ তো বারকোশ, সোনার গহনা-টাকার গাগরাও উঠে আসে।"*[১০০] পীর ফকিরের দরগায় মানত করলে মনোবাসনা পূরণ হয় বলে লোধাশবরেরাও বিশ্বাস করে। নীলুয়া তার মাকে দরগা দেখিয়ে বলেছিল—*"উটাই পীরবাবার দরগা মা, হাতি-ঘোড়া মানসিক দিয়ে যা চাইবি তাই পাবি।"*[১০১]

সেইসঙ্গে তারা প্রতিদিনের জীবনকে অশুভশক্তি বা অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের হাত থেকে মুক্ত রাখতে কিছু সংস্কারকে মেনে চলে। লোকসমাজের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো লোধা-শবর সমাজেও কাকের ডাককে অশুভ বলে ধরা হয়। তারা মনে করে কাকের ডাক অশুভ বার্তা বহন করে আনে। উপন্যাসে দেখা যায়, শিশুবালা একাকী অসুস্থ শ্বশুরকে সেবা-শুশ্রূষা করার সময় কণ্ঠা পড়ে আসলে এবং হিক্কা উঠলে তার মনে আসে, *"কোনো অলক্ষুস কাক এসে বসে আছে কী না।"*[১০২] শিশুবালা চারপাশে খুঁজে যখন কোন কাকের সন্ধান পায়না তখন নুকুকে কুচলাগাছে কাকের সন্ধান করতে বলে *"শিশুবালা হৈ চৈ করে বলল, নাই মা, ডাঁড়কাক ডাকা খারাপ। ডাঁড়কাক ডাকলে মনে জানবি—একটা কিছু খুপুর খবর আসছে।"*[১০৩] আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নুকু এর প্রত্যুত্তরে বলে—*"ধুর, ওসব কুসংস্কার।"*[১০৪] কিন্তু শিশুবালার মন তা মানতে চায়না, তাই সে নুকুকে কটাক্ষ করে বলে—*"নাই নকু নাই। তোকে বলি, পেটে দু'দাগ কালির জল যেত্তে নাই যেত্তে ধরাকে সরা জ্ঞান করিস নাই। শাস্তরের কথা উসব কখনও ভুল হয়?"*[১০৫]

জঙ্গলে রাত-বেরাতে চলাফেরায় অভ্যস্ত শবরেরা জঙ্গল পথে চলাফেরার সময় একমাত্র ভয় পায় পথ পারাপাররত শেয়ালদের। পথ পারাপারে ব্যস্ত শেয়ালদের দেখে তারা শুভাশুভ বিচার করে। ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে গেলে তারা তাকে 'বামশিয়ালী' এবং বাঁদিক থেকে ডানদিকে গেলে 'ডানশিয়ালী' বলে। এদের বিশ্বাস 'বামশিয়াল' হল শুভ এবং 'ডানশিয়ালী' হল অশুভের প্রতীক। বামশেয়ালীর ক্ষেত্রে কোন রকম নিয়ম নেই কারণ এটা শুভ কিন্তু অশুভ অর্থাৎ ডানশেয়ালীর ক্ষেত্রে দু-পা পিছয়ে পুনর্যাত্রার মাধ্যমে দোষ কাটিয়ে নেওয়ার সংস্কার রয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায়, রাইবু একবার জঙ্গল পথে চলাচলের সময় পথ পারাপাররত শেয়াল দেখে দুপা পিছিয়ে গিয়ে শুভ-অশুভ বিচার করে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> *"কুনদিক থেকে কুনদিকে গেল শালার শিয়াল? ডান দিক থেকে বাঁদিকে, বাঁদিক থেকে ডানদিকে? বামশিয়ালী, না ডানশিয়ালী?*
> *ডান-বাম গুলিয়ে ফেলল রাইবু। তারপর কী মনে করে দু-পা পিছিয়ে গেল সে। শিয়ালিটা বাঁ হাত ছেড়ে ডান হাতে যাচ্ছে। ডানহাতী। অশুভ, অশুভ।*
> *দু-পা পিছিয়ে পড়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করবে কী রাইবু? পুনর্যাত্রা? এ-ভাবেই কী দোষ কাটাবে সে? বাপের একটা কিছু হয়ে যায় যদি?"*[১০৬]

এই সংস্কার মঙ্গলকাব্যেও লক্ষ করা যায়। দ্বিজরামদাসের অভয়ামঙ্গলে বলা আছে, *"দক্ষিণে শ্রীগালি দেখে অনুপাম যাএ।"*[১০৭] তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ কাব্যে বলা হয়েছে, *"বামে সার্প দেখিলেন দক্ষিণে স্রিকাল।"*[১০৮]

রাতের আকাশে খালি চোখে কখনো কখনো তারা খসা দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সমাজে এই তারা খসাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার গড়ে উঠেছে। কোনো কোনো সমাজের মানুষ 'তারা খসা' দেখলে নিজেদের ইচ্ছাপূরণের জন্যে প্রার্থনা করে। আবার কোনো কোনো সমাজে 'তারা খসা'কে ভূত-প্রেতের বিশ্বাসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। মোট কথা, তারা খসা, কোনো সমাজে যেমন শুভকারী শক্তি রূপে চিহ্নিত হয়, তেমনি কোনো কোনো সমাজে তা অশুভকারী শক্তি রূপে বিবেচিত হয়।

লোধাশবরেরা তারা খসাকে বলে পাপীতারা। তাদের বিশ্বাস পাপীতারা দেখা পাপ। তাই সেই পাপ কাটানোর জন্যে তারা আঙুল কামড়ে বুকে থুতু ছেঁটায়। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> *"পাপীতারা দেখতে নেই, দেখলেই পাপ। তবু তো ঢুলু ঢুলু চোখে ঠিক পড়ে যায়। তখন কী আর করার থাকে? বড়জোর কঁড়ে আঙুল দাঁতে কামড়ে বুকে থুতু ছেটাও, থুতু ছেটাও আর মুখে বল ছিছি পাপীতারা! বললে পাপ কেটে যাবে, পাপ আর লাগবে না।"*[১০৯]

লোধাশবরেরা বিশ্বাস করে তারামণ্ডলে এমন কিছু তারা আছে যেগুলি মানুষকে পথ ভুলিয়ে দেয়। যাকে তারা 'ভুল্‌কাতারা' বলে। এই ভুল্‌কাতারা দেখলে ডান-দিককে মানুষ ভুল করে বাঁদিক ভাবে, আর বাঁদিককে ভাবে ডান দিক। চাঁদবদনী ও ভুটকিরা প্রতিদিনের মতো জঙ্গলে মাহুল কুঁড়াতে গিয়ে যেদিন মাহুল গাছের তলায় অন্য জাতির মেয়েদের দেখতে পায়না, এবং জঙ্গলের পরিবেশ প্রতিদিনের চেয়ে অন্যরকম ঠেকে সেদিন তাদের মনে হয় তারা আজ পোহাতারা না দেখে ভুল করে হয়তো ভুল্‌কাতারা দেখে বেরিয়েছে?

নিঃসন্তান স্ত্রীর মুখ দর্শনকে লোকসমাজে অশুভ বলে মনে করা হয়। এই ধারণায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মনে করে যাত্রাকালে নিঃসন্তান নারীর মুখদর্শনে অমঙ্গল হতে পারে। এই উপন্যাসেও দেখা যায় রাইবু তার সহকারী গুড়গুড়িয়াকে ফরেস্টের গার্ড নরসিঙার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়েছিল। কিন্তু এই কাজে সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। শুধু তাই নয় নরসিঙা তাকে বাপ তুলেও গালিগালাজ করে। এভাবে অপমানিত হয়ে ফিরে আসার পর বাইবুর মনে হয়—*"আজ সকালে ঘুম থেকে কার মুখ দেখে যে উঠেছিল সে! রাগ করে রাইবুও মনে মনে বলল, নির্ধাত শিশুবালা। আঁটকুড়ি!"*[১১০] ফলে লোকসমাজে প্রচলিত সংস্কারের সাথে লোধা সমাজের সংস্কারের একটা সাজুয্য এখানে লক্ষকরা যায়।

কুকুরের কান্না অশুভবার্তা নিয়ে আসে এই বিশ্বাস লোকমানসে গ্রথিত রয়েছে। আর তা যদি আবার ইনিয়ে বিনে কাঁদে তবে তাকে আসন্ন মহাবিপদের সংকেত বলে মনে করা হয়। জঙ্গলে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নরসিঙা যখন অচেতন হয়ে পড়েছিল তখন রাইবু তার প্রাণ বাঁচায়। লোধাজাতির শত্রু নরসিঙাকে রাইবু প্রাণে বাঁচিয়েছে এই খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে গ্রামবাসীরা দু'ভাগ হয়ে যায়। এক দল রাইবু এই কাজের প্রশংসা করে আর একদল ভাবে সে প্রাণে মেরে ফেললেই পারত। কিন্তু রাইবু নরসিঙাকে মেরে ফেললে এর ফল ভুগতে হতো সমস্ত গ্রামবাসীকে। এই ঘটনা নিয়ে সমগ্র গ্রাম জুড়ে যখন নানান আলোচনা হচ্ছিল তখন শারাবণদের কুকুরের কান্না শুনে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পরে। কেননা তারা বিশ্বাস করে কুকুরের কান্না কোনো বড়বিপদ নিয়ে আসে। *"কুকুরের কান্না কাক-কুয়ার ডাক—এতো ভালো কথা নয়। অশুভ, অশুভ।"*[১১১]

আদিবাসী সমাজে বহুল প্রচলিত বিশ্বাসগুলির মধ্যে একটি অন্যতম হল ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস। আদিম সমাজের সাধারণ সহজ সরল মানুষগুলি যখন কোনো কিছুর রহস্য বা কারণ উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয় তখন তার সঙ্গে তারা কারণ হিসাবে অলৌকিক কিছু ভাবনা যুক্ত করে। ভূত-প্রেতের বিশ্বাসের মূলেও রয়েছে অজানা কিছুর রহস্য উদ্ঘাটনের অবৈজ্ঞানিক প্রয়াস। প্রসঙ্গত বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ্-এর মন্তব্য এখানে প্রনিধানযোগ্য—

> *"স্মরণাতীত কাল থেকে এ পর্যন্ত চলে-আসা যে সব প্রগাঢ় সংস্কার মানুষের মনে বিশ্বজনীন ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে—প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস তার মধ্যে অন্যতম। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মৃত্যুর পর কী হয়, সেই সকৌতূহল উৎকণ্ঠাই আছে প্রেতবিশ্বাসের উৎসে; তারপরে মানুষের প্রায়-সহজাত একটি আদিম সংস্কার—অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কোনও কিছুর কল্পনা করা, সেটাই ঐ উৎকণ্ঠিত কৌতুহলের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিশ্বজনীন ভাবে প্রেত-প্রতিতে পরিণতি পেয়েছে।"*[১১২]

প্রেত সম্পর্কে লোকসমাজের ধারণা, তারা ভালো মন্দ দুই-ই করতে পারে। তাই একদিকে যেমন শুভাকারী প্রেতশক্তিকে খুশি করতে পূজা, অর্ঘ্যপ্রদান ইত্যাদি করে। তেমনি অন্যদিকে অশুভাকারী প্রেতশক্তিকে প্রতিরোধ করতে মন্ত্রপাঠ, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদির আয়োজন করে। 'শবরচরিত' উপন্যাসে লোধা-শবরদের ভূত-প্রেতকেন্দ্রিক বিশ্বাসের বিভিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়। শবরেরা 'চিড়কিন ভূত' নামে একধরনের ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে রাত-বেরাতে শ্মশান-মশানে এই ভূত হঠাৎ আলো জ্বেলে দিয়ে নিভে যায়। *"রাইবু আলোর ভিতর ভূত দেখল। মরে যাবে, পচে যাবে গলে যাবে, বাসি মরা হ'য়ে যাবে রাইবু! অতএব বোঁ-ও-বোঁ করে দৌড়, দৌড়ুচ্ছে। একসময় দুয়ারসিনি থানের ভিতির ঢুকে এল।"*[১১৩] এই ভূতকে বশীকরণ করার নিয়ম অলোচ্য উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। গুণিন বাঁকা দিগারের ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে ভিকা ভক্তা জানিয়েছে—

> *"মরা মেয়েমানুষকে কবর থেকে তুলে জীবন্ত করে ফের মানুষ করতে না পারুক, বাঁকা দিগার তাকে 'চিড়কিণ' ভূত থেকে মেয়েমানুষের রূপ দিয়ে ঘরে এনে বউয়ের মতোই ঘরের কাজ-কাম করাতে পারে বৈকি। তার জন্য লাগে কটা সামান্য উপাচার—একটা ছুরি, কিছু শালপাতা, যাদু-জানা শিশুর মাথার খুলি, একটা কাজললতা, এক প্যাকেট সিঁদুর, কাঠের পিঁড়া একটা।"*[১১৪]

এরকমই আরো কিছু ভূতের নাম শোনা যায় লোধা শবরদের মুখে। যেমন-কালমুহী, ঝাপড়ী, গোমুহা, বরহম্, বারোভূত ইত্যাদি। এদের বিশ্বাস এই ভূতগুলির মধ্যে যদি কেউকে ঘরের বউ করা যায় তবে সারা জীবনের সুখ একেবারে হাতের মুঠোয় চলে আসে। ফনীমনসার গাছে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা একটা ধুতি ছেঁড়া দেখে ভয় পেয়ে রাইবু ভাবে—

> *"গুড়গুড়িয়া থাকলে বলত, নির্ঘাৎ বলত, ন্নাই তা কেনে হবে? উ-কে ধরে-বেঁধে বেহায় বসাতাম আর দমে খাটাতম। খাট শালী, কত খাটবি! ...আছে, আছে। কালা কালামুখী ঝাঁপড়ী গোমুহা বরহম্ চিড়কিনকে বউ করে ঘরে আনা, তার সঙ্গে ঘর-সংসার পাতা, এই লোধা জাইতেও আছে।"*[১১৫]

এছাড়াও, আর এক ধরনের পুরুষ ভূতের অস্তিত্বে লোধাশবরেরা বিশ্বাসী। এই ভূতের নাম কালপুরুষ। কোন মেয়েকে জঙ্গলে একাকী পেলে কখনো মানুষ রূপে আবার কখনো জন্তু রূপে গর্ভে কালবিষ ঢেলে দেয় বলে এদের বিশ্বাস। উপন্যাসে চাঁদবাদনীর মুখে শোনা যায়—

> *"কে জানে কাল্‌পুরষার হাত আরোও কত বড়! একবার ধরলে আর কী ছেড়ে দেবে তাকে? কখন মাছি হয়ে পোকামাকড় হয়ে সে যে ঢুকে আসবে ঘরের ভিতর! কখন ঘুমের ঘোরে ভোগ করে যাবে তাকে। কালবীজ ঢেলে দেবে তার অন্তরে।"*[১১৬]

জটালোধানী জঙ্গলে একবার ভালুকের হাত থেকে কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছিল। বনে মহুল কুঁড়াতে গিয়ে লোধামেয়ে চাঁদবদ্‌নীর সেই কথা মনে পড়লে সে ভাবে, *"ভালুটা কী আর ভালু ছিল, ছিল তো কাল্‌পুরুষা। জটাদিদির অন্তরে ঢালতে চেয়েছিল সে কালবীজ, সেদিন কোনমতে পার পেয়ে গিয়েছিল মেয়্যেটা।"*[১১৭] সেরকমই কালমুহী নামে যে পেত্নীর কথা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি পুরুষের পিছু পিছু নারী ছদ্মবেশে হেঁটে বেড়ায়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়—

> *"সময় সময় কাল্‌মুহীও আসে গাড়ির পিছু পিছু 'বেটিছানা'র ভেক ধরে। রিনঠিন করে মাঝে মাঝে হাতের চুড়ি বাজায়, পায়ের 'খাড়ুয়া'। কখনও কখনও চলে আসে গরুগুলোর পেটি বরারর, গাড়োয়ানের একেবারে হাতের কাছে ডাইনে কী বাঁয়ে।"*[১১৮]

অঙ্কন বা লিখনকেন্দ্রিক সংস্কৃতি

অঙ্কন বা লিখনকেন্দ্রিক সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। আদিম সংস্কৃতির গুহা চিত্রই এর প্রমাণ। চিত্রের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের জন্য গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতি পরবর্তীকালে সৌন্দর্যবর্ধক কারুকার্য হিসাবে পরিণত হয়। গৃহের শোভাবর্ধক কারুকার্য হিসেবে ঘরের মেঝে এবং দেওয়ালে অঙ্কন করার রীতি বিভিন্ন সমাজে বর্তমান। সারা বছরের জন্য এই আলপনা বা দেওয়াল অঙ্কণ হয়ে থাকুক বা না থাকুক অনুষ্ঠানাদিতে এর প্রচলন আজও বহুল পরিমাণে লক্ষণীয়। সে তা

'পিটালি', 'ছঁচ' মাটি, 'খড়ি' মাটি, বা নানান রঙ দিয়ে আঁকা হোক না কেনো। শবরসমাজে তেমন কোনো রীতির প্রচলন না থাকলেও পাশ্ববর্তী সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা আল্পনা এবং দেওয়াল চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায়, কুমোর পাড়ার সন্তোষের সঙ্গে লোধাপাড়ার সাবিত্রী প্রেম বন্ধনে বাঁধা পড়লে সাবিত্রীও তার ঘরে কুমোরদের ঘরের মতো দেয়াল চিত্র করে। ঔপন্যাসিকের কলমে—

> *"নুকু ঘুপচীর পিছনটায় এসে দেখল সাবিত্রীবিটি ঘরের সামনের দিকের দেয়া লে ছঁচ দিয়ে যত না ছবি এঁকেছে, তার চেয়ে পিছনের দেওয়ালটায় নক্সা করেছে বেশি। গোল গোল ফুল, গোলের উপর গোল, গোলের ভিতর ঢুকে তৈরি করেছে আরেকটি গোল। গোল-ফুল। কোথাও সে-ফুলের রং তিলকমাটির 'হল্‌দা' কোথাও বা আঙরা-কালো, আর কোথাও পুঁই মেচড়ির লালা, গিরিমাটি, সীমপাতার সবুজ—"*[১১৯]

অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হওয়া শবরদের কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক নলিনী বেরা যেভাবে তাদের সাংকৃতিক প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত। শবরদের আচার-সংস্কার, রীতি-নীতি, জীবনযাপনের প্রত্যেকটি উপাদানের অনুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে 'শবরচরিত' উপন্যাসে। এদিক দিয়ে দেখলে এই উপন্যাসিটি লেখকের অবিস্মরনীয় সৃষ্টি।

উল্লেখপঞ্জি

১। দাস বেলা, চৌধুরী বিশ্বতোষ(সম্পাদনা): বাংলা আখ্যান: বহুমাত্রিক পাঠ, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১১০।

২। বেরা নলিনী, শবরচরিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, উৎসর্গ

৩। তদেব, প্রচ্ছদ।

৪। তদেব, পৃ. ৯৭।

৫। তদেব, পৃ. ১৩৯।

৬। তদেব, পৃ. ৪৯০।

৭। তদেব, পৃ. ১১১।

৮। তদেব, পৃ. ১৬৪।

৯। তদেব, পৃ. ১৪১-১৪২।

১০। তদেব, পৃ. ১২৩।

১১। তদেব, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪।

১২। তদেব, পৃ. ৬৮৬।

১৩। তদেব, পৃ. ৬৬৩।

১৪। তদেব, পৃ. ৬৯৩।

১৫। তদেব, পৃ. ৭৬।

১৬। তদেব, পৃ. ৬৮৮।

১৭। তদেব, পৃ. ১১৫।

১৮। তদেব, পৃ. ১৭৩।

১৯। তদেব, পৃ. ২১২।

২০। তদেব, পৃ. ২৬৪।

২১। তদেব, পৃ. ১৫৮।

২২। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সম্পা), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃ. ২০২।

২৩। বেরা নলিনী, শবরচরিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১১৭।

২৪। তদেব, পৃ. ১১৮।

২৫। তদেব, পৃ. ১১৭।

২৬। তদেব, পৃ. ৪০।

২৭। তদেব, পৃ. ১২৬।

২৮। তদেব, পৃ. ৩০-৩১।

২৯। তদেব, পৃ. ২৩।

৩০। তদেব, পৃ. ৭৩।

৩১। তদেব, পৃ. ৬০৮।

৩২। তদেব, পৃ. ৪৬১।

৩৩। তদেব, পৃ. ৫০১।

৩৪। তদেব, পৃ. ৫০৮।

৩৫। তদেব, পৃ. ৬৯৮।

৩৬। তদেব, পৃ. ২১/৫০৭।

৩৭। তদেব, পৃ. ৫৮।

৩৮। তদেব, পৃ. ৬৪/২৯৪।

৩৯। তদেব, পৃ. ৬০।

৪০। তদেব, পৃ. ৫৯।

৪১। তদেব, পৃ. ১৪৮।

৪২। তদেব, পৃ. ৬২৮।

৪৩। তদেব, পৃ. ৬২৮।

৪৪। তদেব, পৃ. ৩০৫।

৪৫। তদেব, পৃ. ৬৩৬।

৪৬। তদেব, পৃ. ৩১৫।

৪৭। তদেব, পৃ. ৭৩৬।

৪৮। তদেব, পৃ. ৬৯০।

৪৯। তদেব, পৃ. ৩০৩।

৫০। তদেব, পৃ. ৩২২।

৫১। তদেব, পৃ. ৩২৩।

৫২। তদেব, পৃ. ৫২২।

৫৩। তদেব, পৃ. ৫৩২।

৫৪। তদেব, পৃ. ৫৬২।

৫৫। তদেব, পৃ. ৫৬৩।

৫৬। তদেব, পৃ. ৫৬৪।

৫৭। তদেব, পৃ. ১২৭।

৫৮। তদেব, পৃ. ২৬৪।

৫৯। তদেব, পৃ. ১৬১।

৬০। তদেব, পৃ. ৫৯২।

৬১। তদেব, পৃ. ৫৯২।

৬২। তদেব, পৃ. ৫৯৩।

৬৩। তদেব, পৃ. ৫৯৩।

৬৪। তদেব, পৃ. ৫৯৩।

৬৫। চৌধুরী দুলাল(সম্পাদনা), বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৩৬।

৬৬। তদেব, পৃ. ৮৩।

৬৭। চৌধুরী দুলাল(সম্পাদনা), বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৯৫।

৬৮। তদেব, পৃ. ৬৮৪।

৬৯। তদেব, পৃ. ৯১।

৭০। তদেব, পৃ. ৯১।

৭১। তদেব, পৃ. ৮২।

৭২। তদেব, পৃ. ৮২।

৭৩। তদেব, পৃ. ৫২৯।

৭৪। তদেব, পৃ. ৫০০।

৭৫। তদেব, পৃ. ১৫১।

৭৬। তদেব, পৃ. ১৫১।

৭৭। তদেব, পৃ. ১৫১।

৭৮। তদেব, পৃ. ১৫২।

৭৯। তদেব, পৃ. ৬৭২।

৮০। তদেব, পৃ. ৬৭৪।

৮১। তদেব, পৃ. ১৫৬।

৮২। তদেব, পৃ. ১৮১।

৮৩। তদেব, পৃ. ৫৫১।

৮৪। তদেব, পৃ. ৪৯৫।

৮৫। তদেব, পৃ. ৬৫৮।

৮৬। তদেব, পৃ. ৬৬০।

৮৭। তদেব, পৃ. ৬৬১।

৮৮। তদেব, পৃ. ৩০৮।

৮৯। তদেব, পৃ. ৩২/১২৯।

৯০। তদেব, পৃ. ৭৮।

৯১। তদেব, পৃ. ৭৮।

৯২। তদেব, পৃ. ৮৪।

৯৩। তদেব, পৃ. ২২৩।

৯৪। তদেব, পৃ. ৪৯১।

৯৫। তদেব, পৃ. ৮২।

৯৬। তদেব, পৃ. ২৬৮।

৯৭। তদেব, পৃ. ২৭২।

৯৮। তদেব, পৃ. ২৭৮।

৯৯। তদেব, পৃ. ৩৯।

১০০। তদেব, পৃ. ৫৫৫।

১০১। তদেব, পৃ. ৫৯০।

১০২। তদেব, পৃ. ২১৭।

১০৩। তদেব, পৃ. ২২১।

১০৪। তদেব, পৃ. ২২১।

১০৫। তদেব, পৃ. ২২১।

১০৬। তদেব, পৃ. ২৬৩।

১০৭। দাস আশুতোষ(সম্পা), দ্বিজরাম দাসের অভয়ামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ২৬৯।

১০৮। দাস আশুতোষ(সম্পা), তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ, ক. বি., ১৯৮০, পৃ. ২৫৫।

১০৯। বেরা নলিনী, শবরচরিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩২৭।

১১০। তদেব, পৃ. ৩৬০।

১১১। তদেব, পৃ. ৪২৭।

১১২। সেনগুপ্ত পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, ২০১০, পৃ. ১০৯।

১১৩। বেরা নলিনী, শবরচরিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৩।

১১৪। তদেব, পৃ. ৫৩৩।

১১৫। তদেব, পৃ. ১১৪।

১১৬। তদেব, পৃ. ৩২৮।

১১৭। তদেব, পৃ. ৩৩২।

১১৮। তদেব, পৃ. ৩৩৮।

১১৯। তদেব, পৃ. ১৯৩।

চিত্র সূত্র:

১। চৌধুরী দুলাল(সম্পাদনা), বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৩৬।